মৃত্যুঞ্জয়ী

সতীন সেন

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
৩রা পৌষ ১৩৬৩

●

প্রকাশনা : শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়, বি, এল,
৬৪এ, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩
ফোন : ২৪-৪০৪২

●

মুদ্রণ : শ্রীবিশ্বনাথ শীল
নিউ গোল্ডেন আর্ট প্রেস (প্রাইভেট) লিঃ
১৪, দুর্গা পিতুরী লেন
কলিকাতা-১২

বাঁধাই : ওরিয়েন্ট বাইণ্ডার্স
১০০, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৯

তিন টাকা

উৎসর্গ-পত্র

খ্যাত ও অখ্যাত দেশসেবকদল—ত্যাগে, শৌর্য্যে ও জীবন-তপস্যার আলোকে যাঁহারা মুক্তিপথকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের উদ্দেশে—

'মৃত্যুঞ্জয়ী সতীন সেন'
উৎসর্গীত হইল

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়

নিবেদন

সতীনসেনের জীবন কর্ম্মযোগীর জীবন। নিরন্তর সংঘাত ও সংগ্রামের পথে এ জীবন অগ্রসর হইয়াছে—সেবা, প্রেম ও মুক্তির ব্রত উদ্‌যাপনে মহনীয় হইয়া আত্মাহুতিতে ইহার পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। এই মহাবীরের জীবনে নাটকীয় দ্বন্দ-সংঘাতের বিরাম নাই, চমকপ্রদ কাহিনীরও অপ্রতুলতা নাই। এই সব তথ্য-উপকরণ সংগ্রহ করাও এক সুকঠিন কাজ। কারণ, সতীন্দ্রনাথ চিরদিন ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। বহু মূল্যবান তথ্য ও কাহিনীর স্মৃতি তাই আজ বিস্মৃতির ধূলায় চাপা পড়িয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয়ী সতীনসেনের প্রকৃত জীবনালেখ্যটিকে অঙ্কন করা কঠিন। এ মহামানবের মহিমাকে, ইহার অনুপম স্বরূপকে ফুটাইয়া তোলা আরও দুঃসাধ্য। এ কথাটি আমার অজানা নয়, নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমি সচেতন। তবুও যে এ প্রয়াস আজ করিতে হইল, তাহার কারণ আছে।

একদল ভাগ্যবান লোকের মত সতীনসেনের সহকর্ম্মী হইবার ও ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য আমারও হইয়াছিল, এ জীবন ধন্য হইয়াছিল। তাই, এই চরিত রচনার প্রয়াস আমার কৃতজ্ঞতারই এক নগণ্য নিদর্শন মাত্র। এ গ্রন্থ রচনার আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। সতীন্দ্রনাথের বন্ধু, সহকর্ম্মী ও অনুরাগী ব্যক্তির সংখ্যা অগণিত। আমার আশা, বিরাট চরিত্রটিকে ফুটাইয়া তুলিবার এই ক্ষীণ প্রয়াস ইঁহাদের দ্বারা

পরিপুষ্ট হইবে, সার্থকতর হইবে—বহুজনের স্মৃতিসংগ্রহ হইতে একটি বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচিত হওয়া সম্ভব হইবে।

এ গ্রন্থ রচনার কালে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অনেকে পরামর্শ ও উপদেশ দিয়াছেন, তথ্য যোগাইয়াছেন। ইঁহাদের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। সতীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, সংবাদিক শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র সেনের আবশ্যকীয় উপদেশ কখনই বিস্মৃত হইবার নয়। সতীন্দ্রনাথের একনিষ্ঠ ও আজীবন সহকর্ম্মী, বন্ধুবর শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দত্ত সাগ্রহে আমাকে এ কার্য্যে সাহায্য করিয়াছেন। সতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ও বিশ্বস্ত সহচর শ্রীহরেন্দ্র দাশগুপ্তের সহায়তা আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছে। সতীন্দ্রনাথের সবিশেষ অনুরাগী, 'হিমাদ্রি' সম্পাদক, বন্ধুবর শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য, সুসাহিত্যিক শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য্য এবং সতীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সহকর্ম্মী শ্রীমান বিজয় কুমার চক্রবর্ত্তীর আন্তরিক সহযোগিতায়ও আমি যথেষ্ট উপকৃত হইয়াছি।

সর্ব্বোপরি কৃতজ্ঞতা জানাই পঃবঙ্গের জননেতা ও মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। নিরন্তর কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও এ বইখানি তিনি সাগ্রহে আদ্যোপান্ত পড়িয়াছেন এবং আন্তরিকতাপূর্ণ মুখবন্ধটি লিখিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন। সতীন্দ্রনাথের সহিত ডাঃ রায়ের অন্তরের এক ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল, এই ত্যাগ-ব্রতী বীরের প্রতি বরাবরই তাঁহার নিবিড় শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল—ইহা জানিতাম। ডাঃ রায়ের এ লেখার ছত্রে ছত্রে তাহারই নিদর্শন পরিস্ফুট। ইতি।

-গ্রন্থকার

CHIEF MINISTER
GOVERNMENT OF WEST BENGAL

শ্রীনিকেতন
১৭/১২/৫১

মুখবন্ধ

মুক্তি সংগ্রামের বীর যোদ্ধা, অসামান্য দেশপ্রেমিক সতীন সেনের জীবনী কোন পরিচয়েরই অপেক্ষা রাখে না, কোন ভূমিকাও ইহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সতীনসেনের জীবন তাঁহার নিজেরই তপস্যার আলোকে উদ্‌ভাসিত, ত্যাগ ও সংগ্রাম-কুশলতার জন্য কীর্ত্তিত। নানা কর্ম্মের ক্ষেত্রে, নানা সময়ে দেশমাতৃকার এই সুসন্তানকে দেখিয়াছি—দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া পারি নাই। সেই জন্যই তাঁহার এই চরিতগ্রন্থের ক্ষুদ্র প্রাক্‌-ভাষণটি লিখিতে অগ্রসর হইয়াছি।

সতীনবাবুর সমগ্র জীবন সংগ্রামময়—ত্যাগ-তিতিক্ষাময়। কিন্তু এ সংগ্রাম ও ত্যাগ-তিতিক্ষা তিনি বরণ করিয়াছেন গান্ধীজীর মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া—তাঁহার একনিষ্ঠ অনুগামীরূপে। মুক্তি ও মানব কল্যাণের জন্য, সত্যধর্ম্ম অর্জ্জনের জন্য তাই তিনি এমন অকুতোভয় হইতে পারিয়াছিলেন।

সত্যনিষ্ঠা ও গভীর মানবিকতা-বোধ সতীনসেনকে পাকিস্থান ছাড়িতে দেয় নাই। দুর্গত মানবের কল্যাণ সাধনে, মুক্তির সাধনাকে জয়যুক্ত করিতে তিল তিল করিয়া তিনি আত্মাহুতি প্রদান করেন।

দেশের দিকে দিকে আজ উন্নয়নের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এ সময়ে সতীনসেনের ত্যাগপূত জীবনের আদর্শ বড় মূল্যবান, বড় কল্যাণকর। আজিকার দিনের তরুণগণ এই মহাপ্রাণ দেশসেবকের চরিত কথা আলোচনা করুক, তাঁহার তপস্যার আলোকে পথ দেখিয়া নিক, ইহাই আমার আন্তরিক কামনা।

বিধান চন্দ্র
(বিধানচন্দ্র রায়)

"........হে ধরিত্রী, আছ তুমি জাগি
ত্যাগীরে প্রত্যাশা করি, নির্লোভেরে সঁপিতে সম্মান,
দুর্গমের পথিকেরে আতিথ্য করিতে তব দান
বৈরাগ্যের শূন্য সিংহাসনে। ক্ষুব্ধ যারা লুব্ধ যারা
মাংস গন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টি হারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বিভৎস চীৎকারে তারা রাত্রি দিন করে ফেরাফেরি—
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি........।
............মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখ বিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব............
বলে যাব দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারেনা কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়"।

(রবীন্দ্রনাথ)

কর্ম্মবীর সতীন্দ্র নাথ সেন

(১৮৯৪—১৯৫৫)

সতীন্দ্রনাথ সেন

সতীন সেনের জীবন ছিল বিচিত্র ও কৌতূহলোদ্দীপক। জীবনের প্রারম্ভ এবং জীবনের শেষ—যেন একই মহাকাব্যের অখণ্ড এক কাব্য-ঝঙ্কার। জীবনের সংঘাত ও অন্তরের যে ভাবসমূহকে পুরাণ, নাটক, কাব্য-মহাকাব্যের মধ্যে বিকশিত দেখা যায়, উহারই উপাদান রহিয়াছে সতীন সেনের বেগবান জীবন-ধারার মধ্যে। জীবন ও মৃত্যু ছিল তাঁহার জীবনের প্রতি ক্ষণের পায়ের ভৃত্য।

জীবনের মহোত্তর আদর্শে অবিচলিত থাকিয়া, তিল তিল করিয়া জীবন দান করিয়া, অবশেষে সম্পূর্ণ আত্মাহুতি করিলেন—শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন তিনি অবহেলিত ভাবে বান্ধবহীন নির্জ্জন পরিবেশে। মহান ছিল তাঁহার আদর্শ, তাহার উদ্‌যাপনের মূল্যও দিয়া গেলেন মহীয়ানভাবে—বেদনা, লাঞ্ছনা ও সীমাহীন ক্লেশের মাধ্যমে। এমনই মহৎ বেদনাই যুগে যুগে মহৎ আদর্শ সৃষ্টি করিয়া থাকে।

জীবন সংগ্রামে ক্ষণে ক্ষণে মহান আবেগে সংঘটিত হয় মহান কর্ম্মানুষ্ঠান। কিন্তু সতীন সেনের এই যে চমকপ্রদ

অত্যুজ্জল আত্মোৎসর্গ ইহা কি শুধু ক্ষণিক আবেগের পরিণতি ? যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহার জীবনব্যাপী বিচিত্র তেজোময় কর্ম্মযজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে সতীন সেনের জীবনের পরিণতি ও তাঁহার জীবন-ব্যাপী কর্ম্ম-প্রবাহ ছিল একই সূত্রে গাঁথা—কোথাও ছিল না ফাঁক—কি তাঁহার কর্ম্মে, কি তাঁহার মর্ম্মে, কি তাঁহার ধর্ম্ম-প্রয়াণে।

* * *

জন্ম ও শৈশব

রামসেবক সেন ছিলেন ফরিদপুর জিলার কোটালীপাড়ার বিশিষ্ট বৈদ্য বংশের একজন স্বনাম-ধন্য ব্যক্তি। যেমন ছিল তাঁহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ অবয়ব, তেমনি ছিল উদার উন্মুক্ত প্রাণ!

শুনা যায় প্রায় ৫০ বৎসর বয়সে তাঁহার একবার মৃত্যু ঘটে। শ্মশানযাত্রীরা শব বহন করিয়া চলিতেছে—পথে আসিল প্রবল বর্ষা। ভূমিতে শব-শয্যা রক্ষা করিয়া বহনকারীগণ নিকটবর্ত্তীস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুক্ষণ পরে বিপুল বিস্ময়ে তাঁহারা দেখিলেন—প্রবল বারিধারায় সিক্ত শবদেহ যেন মুখ-ব্যাদান করিয়া অঝোরে পতিত বর্ষার জল আকণ্ঠ পান করিতেছে!

শেষবারের মৃত্যু হয় তাঁহার ৯৬ বৎসর বয়সে। মৃত্যু দিবসে বিশেষ পরিমাণে খৈ এবং দৈ দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন পুত্র-বধূ সৌদামিনীর কোলে।

এই রামসেবকের দুই পুত্র—কৈলাসচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। কৈলাসচন্দ্র ছিলেন বরিশাল জিলার পটুয়াখালী মহকুমার লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ মোক্তার। যেমন ছিল প্রচুর আয়, ব্যয়ও করিতেন তেমনি ভাবে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নির্দ্দেশক্রমে কনিষ্ঠ নবীনচন্দ্রও মোক্তারী ব্যবসায় সুরু করেন পটুয়াখালীতে। মস্ত বড় যৌথ সংসার—বহু আত্মীয়, অনাত্মীয় ও আশ্রিত বহুজন আশ্রয় পাইত সেই সংসারে। অগ্রজের মৃত্যুর পর নবীনচন্দ্রই এই বৃহৎ সংসারের পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন।

সতীন্দ্রনাথের জন্ম হয় ১৮৯৪ সনে এই কোটালীপাড়ার অন্তর্গত বাগান উত্তরপাড়া গ্রামে। জন্মের এগার মাস পরেই মাতা সৌদামিনী দেহ পরিত্যাগ করেন। মাতৃহারা শিশুর ভার গ্রহণ করেন তাঁহার জ্যেঠাইমা এবং তাঁহাকেই সতীন্দ্রনাথ জীবনাবধি মা বলিয়া জানিতেন এবং মা বলিয়াই ডাকিতেন। আপন মাতার শেষ সন্তান ছিলেন সতীন্দ্রনাথ। সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺শৈলেন্দ্রবিহারী সেন পটুয়াখালীর একজন যশস্বী ও প্রতিষ্ঠাবান মোক্তার ছিলেন। সতীন্দ্রনাথের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তিনি দেহ রক্ষা করেন। আপন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ৺নগেন্দ্রবিহারী সেন এম, এ, বি-এল পটুয়াখালীতে আইন-ব্যবসা করিতেন। অত্যল্প বয়সেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার অপর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সরোজিনী দেবী এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সেন ব্যতীত তাঁহার বিমাতা ও পাঁচ ভগ্নী এখনও জীবিত।

নবীনচন্দ্রের শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ ও সুস্থদেহ, সংযত বাক্য—সহজাত গাম্ভীর্য্য ও অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব স্বাভাবিকভাবে সকলকে আকৃষ্টই

করিত। পটুয়াখালী সমাজের তিনি ছিলেন নেতা। তেজস্বিতা, উদারতা ও পরোপকার প্রবৃত্তি ছিল তাঁহার ধর্ম্ম। গৃহের দ্বার ছিল উন্মুক্ত—আত্মীয় অনাত্মীয় নির্ব্বিশেষে সকলের নিকট। এই হেতু উঁহার গৃহের ডাক নামই ছিল—'সরকারী বাসা'।

সতীন্দ্রনাথের শৈশব ও বাল্য অতিবাহিত হয় পটুয়াখালীতে। বাল্য হইতেই সতীন্দ্রনাথের ভিতরে তাঁহার পিতা ৺নবীনচন্দ্রের গুণাবলী যেন সহজাত ভাবে বিকশিত হইতে থাকে। হাল্কা হাসি-ঠাট্টার পরিবেশ তাঁহাকে আকৃষ্ট করিত না। খেলাধূলা প্রভৃতি বালকোচিত কার্য্যাদির মধ্যেও তাঁহার একগুঁয়েমী, তেজস্বিতা এবং ক্ষণে ক্ষণে দুর্দ্দমনীয় ক্রোধ প্রকাশ পাইত। পিতা ছেলেদের সংযত করিতেন, শাসন করিতেন না। আপনাপন চারিত্রিক বিকাশে সহায়তা করিতেন—নিজ মত জোর করিয়া চাপাইতেন না। হয়তো এই স্বাধীন আবহাওয়া ছিল বলিয়াই সতীন্দ্রনাথকে উত্তরকালে **সতীন সেন** রূপে দেশ পায়।

সতীন্দ্রনাথের পাঠ্যজীবন সুরু হয় পটুয়াখালী জুবিলী হাই স্কুলে। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ৺বরদাকান্ত সেনগুপ্ত ছিলেন বিশেষ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার ইংরাজী বলার ধরণ, তাঁহার দৃঢ় পদক্ষেপ, সংযত বচন ও গভীর দৃষ্টি বিশেষ সম্ভ্রম জাগ্রত করিত। হয়তো পিতার পর এই প্রধান শিক্ষক সতীন্দ্রনাথের কৈশোর মনের উপর গভীর ছাপ দিয়া থাকিবে।

বিদ্যালয়ে ইতিহাস ও ইংরেজীর উপর তাঁহার ছিল অতিরিক্ত আকর্ষণ। হয়তো প্রধান শিক্ষকের ইংরেজী বলার ধরণ আয়ত্ত

করার জন্যই ইংরাজী ওয়েবষ্টার অভিধান কণ্ঠস্থ করিবার প্রয়াস পান। পরবর্ত্তীকালে তাঁহার স্পষ্ট, সরল আয়াস-হীন ইংরাজী উচ্চারণ-পদ্ধতি সম্ভবতঃ এই প্রয়াসেরই সার্থক পরিণতি।

* * * *

চরিত্রানুশীলন

১৯০৫ সন ছিল সমগ্র বাংলা দেশের যুগ পরিবর্ত্তনের সন্ধি-ক্ষণ। বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন, রুশ-জাপান যুদ্ধ, অরবিন্দ-তিলকের বিপ্লবী ভাবধারা জাতীয় কংগ্রেসের সংহতি—সমগ্র দেশকে এক বিরাট জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে। এই পরিবেশে পূর্ব্ব হইতেই বরিশাল জিলায় নূতন নূতন ভাবধারা প্রবাহিত হইতেছিল। ৺কালীশ পণ্ডিত মহাশয়ের 'Little Brothers of the poors' রূপে সেবা কার্য্যের এক বিচিত্র কর্ম্ম প্রচেষ্টা, আচার্য্য জগদীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম এবং ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মাধ্যমে তরুণ দলে সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার আদর্শ চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস, মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের 'ভক্তি-যোগে'র ভিত্তিতে জাতীয় চরিত্র বিকাশের আহ্বান ও তাঁহার রাজনৈতিক বেগবান কর্ম্মযোগ, চারণ কবি মুকুন্দ দাসের জাতীয় সঙ্গীতের উন্মাদনা যেমন চলিতেছিল, তেমনি সকলের প্রাণে সাড়া দিয়াছিল দেশের স্বাধীনতার জন্য, সমগ্র বিপ্লবের স্বপ্ন সফল করিবার জন্য, বরিশালের শঙ্কর মঠের পরম জ্ঞানী বিপ্লবী তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দের আকুল আহ্বান। তিনি চাহিলেন এমন একদল তরুণ—যাঁহারা হইবেন ধর্ম্মে বিপ্লবী, কর্ম্মে নিষ্কাম কর্ম্মী এবং

অন্তরে সাধক। তাঁহার দৃষ্টিতে সন্ন্যাস জীবন ও বিপ্লবী জীবন ছিল একই পত্রের দুই দিক।

এইরূপ পরিবেশে মুকুন্দদাস তাঁহার প্রাণ-মাতান উদ্দীপনায় জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া গেলেন পটুয়াখালীতে। কিশোর বালক সতীন্দ্রনাথের অন্তরে এক অজানা ভবিষ্যতের সুর ঝঙ্কার দিয়া গেল। কে জানে কোন প্রেরণায় ১০ বৎসর বয়সের সতীন্দ্রনাথ গৃহ ত্যাগ করিয়া উপস্থিত হইল মুকুন্দ দাসের নিকট পথ-নির্দ্দেশের জন্য। অবশ্য অশ্বিনী দত্তের হস্তক্ষেপের ফলে বালক তাহার পিতার নিকট পটুয়াখালীতে প্রেরিত হইল।

পটুয়াখালীর উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাসের সময় সতীন্দ্রনাথের প্রধান সহাধ্যায়ী ছিলেন সুধীর কুমার দাশ গুপ্ত। সুধীর কুমার ছিলেন মেধাবী, আদর্শনিষ্ঠ, দার্শনিক ভাবাপন্ন, সংস্কৃত পাঠে উৎসাহী এবং শাস্ত্রানুশীলনে আগ্রহশীল। সুতরাং এই সুধীর কুমারের উদ্যোগে স্বাভাবিক ভাবে গঠিত হইল একটী ছাত্র-চক্র, যেখানে সমবেত হইল সহরের যাবতীয় আদর্শবাদী তরুণ ছাত্র-দল। সুধীর কুমারের বয়সোচিত প্রজ্ঞা ও বাগ্মীতা বিশেষ ভাবে তরুণ ছাত্রদের নূতন জীবনাদর্শের দিকে আকৃষ্ট করিল।

প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ, ব্যায়াম, আসন-প্রাণায়াম, গীতাপাঠ ও বিবিধ আধ্যাত্মিক শাস্ত্রালোচনা চলিতে থাকিল জনসাধারণের দৃষ্টির বাহিরে। প্রকাশ্যে তাঁহাদের ব্যবহার ছিল নির্লিপ্ত, বাক্য স্বল্প সংযত আহার, বিলাসিতা বহির্ভূত বস্ত্রাবরণ, নগ্নপদ ও মস্তকে ক্ষুদ্রাকারে কর্ত্তিত কেশরাশি। আসক্তি-হীন পরিবেশে নূতন

জীবন-সন্ধানী ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকিত তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

তখনকার দিনে ছাত্র ও তরুণ-যুবকদের প্রধানতম কর্ম্ম ছিল সেবাধর্ম্ম। বসন্ত বা বিসূচিকা রোগ যখন মহামারী রূপে দেখা দিত তখন সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে, বিপদকে সম্পূর্ণ ভাবে বিস্মৃত হইয়া মুমূর্ষু অসহায় আর্ত্তের শয্যাপার্শ্বে সমবেত হইত যাঁহারা, তাঁহারা ছিলেন এই সব নূতন জীবন-সন্ধানী তরুণ দল। সেবা ধর্ম্মে হিন্দু-মুসলমান, স্পৃশ্য বা অস্পৃশ্য বলিয়া কোন জাতি থাকিত না—মানুষই ছিল এক জাত। পথের প্রান্তে পরিব্যাপ্ত অভুক্ত অসহায়ের সহায়ক ছিল ইহারা। দরিদ্র ছাত্রদের সহায়তার জন্য গোপন ভাবে সংগৃহীত হইত মুষ্টি ভিক্ষা। এইরূপ ভাবেই চলিতেছিল তরুণদের অন্তর ও বাহিরের জীবনানুশীলন!

ইতিমধ্যে সুধীর কুমারের সহিত বরিশালের বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দের হইল শুভ সংযোগ। স্বামীজীর নির্দ্দেশে এবং প্রেরণায় বিপ্লবী মন্ত্রের পাঠ গ্রহণের শিক্ষা হইল সুরু। আধ্যাত্মিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে তখনকার সময়ের রাষ্ট্র-নৈতিক বিপ্লব-সাধনের প্রস্তুতির পথে সহায়ক গোপনীয় বিবিধ পুস্তক ও লেখা আসিতে সুরু হইল।

উক্ত 'তরুণ চক্রে' বিশেষ আগ্রহের সহিত হইত উহা পাঠ ও আলোচনা। পরস্পর আলোচনা হইত—খাঁটী বিপ্লবীকে হইতে হইবে প্রকৃত সন্ন্যাসীর ন্যায়—ঘৃণা, লজ্জা, মান-অভিমানে ভ্রূক্ষেপহীন এবং অভয় মন্ত্রে বীর্য্যবান। ভীরুতা ও কাপুরুষতা

পরিত্যাগে হইতে হইবে দুর্জ্জয় সাহসী ; সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতা বা কপটতার পরিবর্ত্তে চাই পরার্থে নিজেকে বিলাইয়া দিবার প্রচেষ্টা। আত্ম-প্রচার বিষবৎ পরিহার করিতে হইবে।

অমাবস্যার ভীষণ রজনীতে নির্জ্জন মহাশ্মশানে একা রাত্রিবাস, উত্তাল তরঙ্গায়িত প্রশস্ত নদী অতিক্রম, পথ-ঘাটহীন অজানা পথ ও প্রান্তরে দীর্ঘ পদব্রজে পরিক্রমা—ইহাই ছিল বিপ্লবীর শিক্ষার প্রথম পাঠ।

প্রথম কৈশোরে সতীন্দ্রনাথের মধ্যে ক্রমশঃ যেন আপাত-বিরুদ্ধ রুক্ষ স্বভাবের প্রকাশ পাইত। কারণ তখন চলিতেছিল তাহার অন্তর্মুখী আত্মোন্নতির প্রচেষ্টা। স্বভাবত এই বয়সের অপর তরুণদের ন্যায় চপলতার পরিবর্ত্তে দৃঢ়তাব্যঞ্জক আচার ব্যবহারের প্রকাশ ছিল বেশী। সুতরাং কেহ তাহাকে বেশী ঘাঁটাইতে চাহিত না। ইতিমধ্যেই সতীন্দ্রনাথ একগুঁয়ে বদ-মেজাজী, অসামাজিক গোঁয়ার নামে অভিহিত হইল। প্রচণ্ড বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িত তাহার ক্রোধ—ক্রোধের সময় সমবয়সী বা বয়োজ্যেষ্ঠ কেহই তাহার সম্মুখে আসিতে পারিত না —অদ্ভূত প্রকাশ ছিল তাহার ব্যক্তিত্ব—ঐ বালক বয়সেই। অবশ্য ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইত অন্যায়ের বিরুদ্ধে। অথচ এমনি প্রচণ্ড অগ্নি-বর্ষী উদ্দীপ্ত ক্রোধের মধ্যেই দেখা যাইত তাহার অন্তরের বিগলিত করুণার বহিঃপ্রকাশ।

এমনই একটি ঘটনাই ঘটিয়া গেল—কয়েকটি মূক জীব—অসহায় কুকুরের করুণ আর্ত্তনাদে।

তাহাদের বাসা ছিল 'সরকারী বাসা'। আত্মীয়-অনাত্মীয় ব্যতীত প্রত্যহ বহু অতিথি অভ্যাগতের সমাগম ছিল তাহাদের গৃহে। সুতরাং নিক্ষিপ্ত প্রচুর ভুক্তাবশেষের লোভে, বহু সংখ্যক কুকুর আশ্রয় গ্রহণ করিত তাহাদের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে। আশ্রিত কুকুরের দল ক্রমেই বাড়িয়া চলিল।

এদিকে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির নির্দ্দেশে সরকারী সড়কের উপর প্রাপ্ত যাবতীয় কুকুর নিধনের জন্য নিযুক্ত হইল কতিপয় ডোম। নিষ্ঠুর উপায়ে কুকুর হত্যা চলিল।

নির্জ্জন গৃহে স্বাভাবিক পাঠাভ্যাসে ছিল ব্যস্ত সতীন্দ্রনাথ। অকস্মাৎ একটী কুকুরের করুণ আর্ত্তনাদে চকিতে বাহির হইয়া দেখিল অর্দ্ধমৃত কুকুরের অসহায় ব্যাকুল চাহনী। বেদনায়-আপ্লুত-মমতায় অন্তরের দহন জ্বালা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ, রক্তলোচন সতীন্দ্রনাথ ঝাঁপাইয়া পড়িল হত্যাকারী ডোমদের উপরে। দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য সতীন্দ্রনাথ কিল ঘুষি, পদাঘাতে ডোমদের জর্জ্জরিত করিল। তবু ক্রোধ দমিত হইল না। লৌহ-শীর্ষ হত্যা-দণ্ড-যষ্টি সবেগে গ্রহণ করিয়া পদাঘাতে ভাঙ্গিয়া ফেলিল; তবু অন্তর শান্ত হইল না। যষ্টির ভগ্ন অংশগুলি তুলিয়া ছুটিল তাহাদের বৃহৎ রান্নাঘরের দিকে। প্রজ্বলিত উনুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল ভগ্ন যষ্টি সমূহ। যতক্ষণ না উহা ভস্মীভূত হইয়া ভস্মে পরিণত হইল,—পার্শ্বে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল সতীন্দ্র নাথ। এমনই তাহার প্রচণ্ড ক্রোধ!

রাষ্ট্রনৈতিক আবহাওয়া

১৯০৫ সনে বরিশাল শহরের রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে আয়োজিত হইল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মেলন। নির্ব্বাচিত সভাপতি ছিলেন সর্ব্ববরেণ্য নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারী প্রচেষ্টায় সভাকে করা হইল পণ্ড এবং সুরেন্দ্রনাথ হইলেন গ্রেপ্তার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এমার্সনের আদেশে। কর্ত্তৃপক্ষ শুধু গ্রেপ্তার করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, উৎসাহ আবেশে উদ্বেলিত বিপুল জনতার সমবেত উচ্চারিত 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিকে স্তব্ধ করিয়া দিল পুলিশ বিপুল বিক্রমে লাঠি চালাইয়া। বন্দেমাতরম উচ্চারণ করাও যেন ছিল সরকারের নিকট বিভীষিকা-ময়। সভা-মণ্ডপ লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল। নিষ্ঠুর প্রহারে জর্জ্জরিত জনতা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। তবু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছিল এখানে সেখানে সমবেত-কণ্ঠে। অত্যাচার ও অনাচার চলিল সর্ব্বদিকে।

মুহুর্মুহু লাঠি পেটা খাইতে খাইতেও চিত্ত গুহ ঠাকুরতা 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করিয়া চলিলেন যতক্ষণ ছিল তাঁহার জ্ঞান—তাঁহার কণ্ঠ স্তব্ধ হইল তখন যখন দেহ হইল অচেতন। এক নূতন ইতিহাস রচিত হইল বরিশাল শহরে।

এই নির্দ্দয় অত্যাচারে বরিশাল-বাসীদের মন দমিত হইল না। অশ্বিনী কুমারের আহ্বানে ইহার প্রতিবাদ আরম্ভ হইল স্বদেশী গ্রহণ এবং বিদেশী বর্জ্জনে। এই বর্জ্জন আন্দোলনের তীব্র মাদকতায় সমুদয় বরিশাল জিলা ভরিয়া উঠিল। হাটে,

ঘাটে ও মাঠে মাঠে, দিকে দিকে গীত হইল—

বেত মেরে কি মা ভোলাবি,
আমরা কী মার সেই ছেলে,
দেখে রক্তা-রক্তি বাড়বে শক্তি—
কে পালাবে মা ভুলে।
যায় যাবে জীবন চলে।

● ● ●

পটুয়াখালী রাষ্ট্রীয় সম্মেলন—

এইরূপ পরিবেশে ১৯০৭ সনে পটুয়াখালী শহরে আহ্বান করা হয় জেলা রাষ্ট্রীয় সম্মেলন। কিন্তু সরকারী আদেশে উহা বন্ধ করা হইল। বয়োবৃদ্ধেরা এই অপমান-জনক ব্যবহারে বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং ইহার ফলে তরুণদের মনেও জাগ্রত হইল সরকারী এই অদ্ভুত ব্যবহারের উপযুক্ত প্রতিশোধ লইবার বাসনা।

উক্ত আয়োজিত সম্মেলনের বাজেয়াপ্ত টিন-কাঠ-দ্বারা তৈয়ারী এই সরকারী কর্ম্মচারীদের ক্লাব-ঘর। জন সাধারণের প্রতি অবমানের মাত্রা হইল পূর্ণ! রাত্রির অন্ধকারে একদিন উক্ত ক্লাব-ঘর হইল ভস্মীভূত। অদূরে আনন্দে উৎফুল্ল তরুণদের মধ্যে সে দিন ছিল তরুণনেতা সতীন্দ্রনাথ। সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান ছিল সতীন্দ্রনাথের জীবনে বিপ্লবের পথে প্রথম পদ-ক্ষেপ। বয়স ছিল তার তখন মাত্র বারো।

বিপ্লবী সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

এদিকে বরিশালে বিদ্রোহী সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ মানুষ গড়ার সাধনায় ছিলেন মগ্ন। তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, জলন্ত বিশ্বাস, অগাধ পাণ্ডিত্য তরুণদের চিত্তকে—মানুষ হওয়ার প্রবৃত্তিকে চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণ করিয়াছিল। ফলে তরুণ যুবকেরা যেন অজ্ঞাতসারেই ভীড় করিতে থাকিল তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে। তারুণ্যের প্রবল আবেগে কেহ চাহিল জ্ঞানযোগের শিক্ষা, আবার অনেকে চাহিল কর্ম্মযোগের দীক্ষা।

পরাধীন ভারতে আধ্যাত্মিক বিকাশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনা হইল কর্ম্মযোগ এবং প্রকৃত নিস্পৃহ ও নিস্কাম কর্ম্মযোগী দ্বারাই সম্ভব ভারতের বিপ্লবানুষ্ঠান ও মুক্তি-সাধনা—ইহাই ছিল প্রজ্ঞানন্দের দৃঢ় প্রত্যয়।

কর্ম্মযোগের এই নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গীতে প্রবুদ্ধ হইয়া নবমন্ত্রে নব ব্রতে যে সব অসংখ্য কৃতসঙ্কল্প তরুণ যুবক দীক্ষা গ্রহণ করেন তাহাদের মধ্যে ছিলেন কিরণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী, শ্রীনিশিকান্ত গাঙ্গুলী, শ্রীজিতেন কুশিয়ারী, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীঅরুণ গুহ, সুধীর দাশগুপ্ত, সতীন সেন, স্বামী আত্মানন্দ, শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীমোহিনী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। স্থানীয় ছাত্র যুবকগণ ব্যতীত বাংলা দেশের বিভিন্ন-স্থান হইতে বহু তরুণ যুবকগণ তাহার সংস্পর্শে আসেন। বিপ্লবী সংস্থা 'যুগান্তর' দলের বিশিষ্ট বিপ্লবী যতীন মুখোপাধ্যায়, শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহরিকুমার

চক্রবর্ত্তী, শ্রীভূপতি মজুমদার, শ্রীঅমর ঘোষ প্রভৃতির সহিত স্বামীজীর ছিল বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক।

স্বামীজীর মাধ্যমেই সেদিন যেন এক তড়িৎ-শক্তির বিপুল স্রোতধারা সমগ্র দেশে প্রবাহিত হইতেছিল। পরবর্ত্তী জীবনে উক্ত তরুণদলের প্রায় অনেকেই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে অনেকেই আজ পর্য্যন্ত চিরকুমার থাকিয়া নিজ বিশ্বাসমত দেশ সেবায় নিযুক্ত আছেন।

* * * *

স্বামী পুর্ণানন্দ গিরি।

স্বামীজীর কর্ম্মধারার সহিত আর একটী ভাবধারা বরিশালের তরুণদের মনে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।—শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় ছিলেন ভোলা মহাকুমার আইনব্যবসায়ী, কিন্তু অন্তরে ছিলেন মহা যোগ-সাধক। প্রথমে রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ছিলেন তিনি অগ্রণী এবং ক্রমশঃ বিপ্লবী ভাবধারায় সহযোগী হইলেন স্বামীজীর সান্নিধ্যে। কিন্তু অচিরেই পরিপূর্ণ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বত্যাগী হইয়া, হিমাচলে চলিয়া যান এবং সন্ন্যাস অবস্থায় নাম গ্রহণ করেন স্বামী পূর্ণানন্দ গিরী।

পরবর্ত্তীকালে বরিশাল জিলার বিভিন্ন স্থানের কীর্ত্তিবান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রীধারী যুবকগণ তাঁহার আদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া গৃহ ও আত্মীয়-পরিজন পরিত্যাগ করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া হিমালয়ের নির্জ্জনে সাধন-ভজনে জীবন উৎসর্গ করেন।

ইহাদেরই মধ্যে সতীন্দ্রনাথের সহাধ্যায়ী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু পটুয়াখালীর সুরেশ সেনগুপ্ত, দেবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অপূর্ব্ব মুখার্জী, নিবারণ চক্রবর্ত্তী, মহেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেকে ছিলেন। ইহাদের মধ্যে কেহই আর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। সুতরাং সতীন্দ্রনাথের সমগ্র কৈশোর ও কৈশোরোত্তর যৌবনের প্রারম্ভে যে দুইটী ভাবধারা প্রবলভাবে তাঁহার জীবনকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে—তাহা হইল স্বামীজীর উদ্দাম কর্ম্মোন্মাদনা ও স্বামী পূর্ণানন্দ গিরী মহারাজের জ্ঞানযোগের প্রবল অধ্যাত্ম উন্নতির তৃষ্ণা, কিন্তু সতীন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাঁহাকে কার্য্যের দিকেই আকর্ষণ করিল। কেন না এক এক সময় তাঁহার মনে এমন প্রবল বৈরাগ্যভাব উদয় হইত যে হয়তো বা সংসার পরিত্যাগ করিয়া হিমালয় চলিয়া যাওয়াও তখন তাঁহার পক্ষে-বিস্ময়ের বিষয় হইত না।

প্রজ্ঞানন্দের সহিত সুধীরকুমার ও সতীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র সৃষ্টি হয় শ্রীযুক্ত জিতেন কুশীয়ারী মহাশয়ের মারফতে। সতীন্দ্রনাথ নিতান্ত বালক তখন। পরবর্ত্তী কালে স্বামীজীর নির্দ্দেশেই সতীন্দ্রনাথ আসেন শ্রীনরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষ রূপে, বিপ্লবের-বাস্তব-কর্ম্মে।

* * * *

হাজারীবাগ কলেজ

১৯১২ সনে পটুয়াখালী জুবিলী হাই স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর তাঁহাকে ভর্ত্তী করা হইল সুদূর

হাজারীবাগের সেণ্ট কলাম্বাস কলেজে। অভিভাবকদের ধারণা ছিল যে সঙ্গী-সাথীদের নিকট হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন রাখিতে পারিলে হয়তো নূতন পরিবেশে তাঁহার মানসিক পরিবর্ত্তন আসিবে। তাঁহার 'উড়ো' মন হয়তো সংসারের দিকে আবার আকৃষ্ট হইবে—আত্মীয়দের ইহাই ছিল কামনা।

মিশনারী কলেজ। যত সাহেবী আচার-ব্যবহার। ভাষা যখন ইংরাজী, পোষাকও তেমনি ইংরেজ ঘেষা। চলনে, বলনে, আহারে, ব্যবহারে সব সময়েই উগ্র ইংরাজীপনা। ভাব যেন এই যে উহার অনুশীলনের মধ্যেই রহিয়াছে সার্থকতা ও আত্মগৌরব।

নিজ ক্ষুদ্র সহর পটুয়াখালী হইতে অনভিজ্ঞ সতীন্দ্রনাথ নিক্ষিপ্ত হইলেন এমন পরিবেশে, যাহার ঔজ্জ্বল্য যে কোন সমবয়সী তরুণকে বিহ্বল করিতে সক্ষম। মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাঁহার কর্ত্তব্য ঠিক হইয়া গেল। যে বিপ্লব-ব্রত ও সন্ন্যাস-মন্ত্র গ্রহণের প্রস্তুতি চলিতেছিল তাঁহার মধ্যে, উহারই পরীক্ষা সুরু হইল নূতন পরিবেশে! অস্বীকার করা হইল ইংরাজী আচার, ইংরাজী আদব কায়দা। নগ্নপদ, ধুতি চাদর পরিহিত তরুণ ছাত্র সুরু করিলেন স্ব-পাক নিরামিষ আহার—নিজ কক্ষে। অলক্ষ্যে চলিতেছিল তাঁহার আসন-প্রাণায়াম গীতাপাঠ এবং স্বাধীনতার দীক্ষা-পদ্ধতি ও বিপ্লবীর মন্ত্র-সাধনা।

তীব্র আলোড়ন ছড়াইয়া পড়িল হাজারীবাগ মিশনারী কলেজে। কলেজের ঐতিহ্য, মান-ইজ্জত কি কলঙ্কিত হইবে

একটী অর্ব্বাচিন নেটিভ গোঁয়ার ছাত্রের অভূতপূর্ব্ব আচার-ব্যবহারে ? এর প্রতিকার চাই। ছাত্র ও শিক্ষকগণ ছুটিলেন অধ্যক্ষ মিঃ টমসনের নিকট। বিস্মিত মিঃ টমসন দেখিলেন আপাত-বিরোধী আচার ব্যবহারের মধ্যে রহিয়াছে তীব্র সার্থকতার আকাঙ্ক্ষা। তিনি চমকিত হইলেন সতীন্দ্রনাথের সরল স্পষ্ট ইংরাজী বাচন-ভঙ্গীতে। বুঝিলেন এ ছেলেগোঁয়ার বা প্রতিক্রিয়াশীল নয়—ইহার মধ্যে তিনি দেখিলেন প্রকৃত সত্যের রূপ। উচ্ছ্বসিত ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন—The boy is a true christian.—"বালকটী হ'লো প্রকৃত খৃষ্টান।"

"তরুণ" বিদ্রোহীর আত্মিক-জয় হইল স্বীকৃত।

কঠোর নিষ্ঠাবান, পরিশ্রমী, প্রখর বুদ্ধি-দীপ্ত ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন এই তরুণ ছাত্রের প্রতি স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হইলেন মিঃ টম্‌সন্‌। গভীর স্নেহে বুঝিবার প্রয়াস পাইলেন সতীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা, উন্মুক্ত করিয়া দিলেন পাঠাভ্যাসের সর্ব্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা ও অবসর।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী প্রচেষ্টায় নিজকে উপযুক্ত করিবার যে দীর্ঘ সাধনা চলিতেছিল, এখন তাহার সার্থক সময় আগত-প্রায়। হাজারীবাগ কলেজ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিবার জন্য মন তাঁহার চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিঃ টম্‌সনের স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে।

হাজারীবাগ কলেজে বোটানী শিক্ষার ব্যবস্থা নাই সুতরাং বোটানী শিক্ষার অজুহাতে তাঁহাকে কলিকাতা যাইতে হইবে।

কিন্তু মিঃ টম্‌সন্‌ তাঁহার এই পাগলাটে ছাত্রের জন্য বোটানী শিক্ষারও আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও শেষ পর্য্যন্ত সতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়া বঙ্গবাসী কলেজে ভর্ত্তী হইলেন।

* * * *

বিপ্লবী কর্ম্ম-প্রয়াসে

বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যয়ন কালে সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটের একটী গৃহ ছিল তাঁহার থাকিবার স্থান। আহার নিজেই প্রস্তুত করিতেন। ক্রমে বিপ্লবী-গোপনচারীদের যোগাযোগের কেন্দ্র হইয়া উঠিল এই ক্ষুদ্র গৃহ। সতীন্দ্রনাথ তখন বিপ্লবী যুগান্তর দলের একজন তরুণ সভ্য। প্রথিত-যশা এম্‌, এন্‌, রায় ভারতবর্ষ হইতে পলাইয়া যাইবার পূর্ব্বে এই গৃহেই একটি রাত্রি যাপন করেন।

সাহসী, কর্ম্মঠ, চতুর, ইংরাজী ভাষণে পটু ও স্বল্পবাক তরুণ সতীন্দ্রনাথের উপর আদিষ্ট হইল আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করা। সাইকেল-আরোহী ফেরীওয়ালার ছদ্মবেশে যোগাযোগ রাখিতেন তিনি বহু ইয়োরোপীয় সাহেবদের সহিত। অর্থের বিনিময়ে বহু ইয়োরোপীয় নাবিকদের নিকট হইতে তিনি এই ভাবে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

তরুণদের স্বপ্ন সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। ইহার জন্য যেমন চাই প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র, তেমনি প্রয়োজন এক আত্ম-বিসর্জ্জনের নূতন আদর্শ সৃষ্টি। অর্থের জন্য আবশ্যক বিপুল

অর্থ, সে অর্থ আসিতে পারে একমাত্র ধনবানদের নিকট হইতে। যখন স্বেচ্ছায় অর্থ আসে না, তখন সমষ্টির কল্যাণ-যজ্ঞে ব্যক্তির আহুতি অনিবার্য্য হইয়া পরে,—সুতরাং স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ভাবে সম্ভব অর্থ সংগ্রহ করিতেই হইবে।

* * * *

শিবপুর ডাকাতি

আদর্শের পথে এমনি অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ১৯১৫ সনে শ্রীনরেন্দ্র নাথ ঘোষ চৌধুরীর পরিচালনায় যে বিপ্লবী দল কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত শিবপুরের এক বিত্তশালী ব্যক্তির গৃহে হানা দেয়, সতীন্দ্রনাথ ছিলেন সেই বিপ্লবীদেরই একজন।

নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত কঠোর ভাবে অর্থ সংগৃহীত হইল। কার্য্যশেষে, নির্দ্ধারিত ব্যবস্থামত ভিন্ন ভিন্ন দলে, বিপ্লবী দল পলাইবার চেষ্টা করিলেন।

তেমনই এক দলে ছিলেন সতীন্দ্রনাথ। রজনী শেষে চমৎকৃত হইয়া দেখিলেন যে বৃহৎ জনতা সহ সশস্ত্র পুলিশবাহিনী কর্ত্তৃক তাঁহাদের চতুর্দ্দিকের পথ হইয়াছে অবরুদ্ধ। তরুণ বিপ্লবী যেন হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—যে ভাবেই হউক অগ্রসর হইতেই হইবে।

সুরু হইল দিনমানে উভয়পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রের যুদ্ধ। এক দিকে দুঃসাহসী বেপরোয়া তরুণ দল, অপর দিকে সরকারী বেতনভোগী পুলিশ দল। সারাদিন একই ভাবে লড়াই করিতে করিতে তাঁহাদের পথ রুদ্ধ হইল এক নদীকূলে আসিয়া। এবার বিপদ অনিবার্য্য। ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর

তরুণ দল এবার হইল বিভ্রান্ত। অদূরে শ্রুত হইতেছিল পুলিশবাহিনী পরিচালিত জনতার চিৎকার ধ্বনি, আর ছিল রাইফেলের গুলী ছোঁড়ার শব্দ।

সহসা দেখা গেল অদূরে রক্ষিত একটী ছোট একখানা ডিঙ্গি। খোলা ভাসমান ডিঙ্গির উপর আরোহণ করিয়া তরুণ দল সাধ্য-মত ডিঙ্গি চালাইতেছিল। নদী-তীরে দাঁড়াইয়া পুলিশেরা গুলী চালাইতেছিল। প্রত্যুত্তরে বিপ্লবী তরুণরাও চালাইতেছিল তাহাদের মসার পিস্তল।

সতীন্দ্রনাথের একহাতে ডিঙ্গির হাল অপর হস্তে পিস্তল। এই অসমান যুদ্ধে আহত ও অপরাজিত রূপে পুলিশ-বেষ্টনী ভেদ করিয়া কী ভাবে যে এই তরুণ দল বাহির হইতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা অতীব বিস্ময়ের বিষয়। এই যুদ্ধের প্রধান যোদ্ধাই ছিলেন সতীন্দ্রনাথ।

অবশ্য এই ঘটনার ফলে নেতা নরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী সুধীর কুমার দাশ গুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বহু কর্ম্মী সহ সতীন্দ্রনাথ ধৃত হন। দীর্ঘ দিবস মামলা চলে। সতীন্দ্রনাথের পিতা ৺নবীন চন্দ্র মহাশয় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রসিদ্ধ আইন-জীবি নিশিথ সেন মহাশয়কে নিয়োগ করেন। শ্রীনরেন ঘোষ চৌধুরী প্রভৃতি কয়েকজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অপর অনেকের বিভিন্ন কাল কারাদণ্ড হইলেও সুধীর কুমার সহ সতীন্দ্রনাথ সন্দেহের অবকাশে হইলেন মুক্ত। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই জেল-গেটের বাহিরে আসিতে না আসিতেই

পুনরায় তাঁহাকে ভারত রক্ষা আইনানুসারে গ্রেপ্তার করা হইল। আইনের প্রহসনে সতীন্দ্রনাথ হইলেন বন্দী!

* * * *

অন্তরীণ অবস্থা

সর্ব্বপ্রথম খুলনা জেলার কালীগঞ্জে সতীন্দ্রনাথকে অন্তরীণ করা হয়। তথায় জলবায়ু নিকৃষ্ট থাকায় অনতিকালের মধ্যেই হইলেন রোগাক্রান্ত। অনেক লেখা-লেখির পর তাঁহাকে বহরমপুর জেলে প্রেরণ করা হয় এবং পুনরায় অন্তরীণ অবস্থায় সেখান হইতে পাঠান হয় মালদহ জিলার বামনগোলা থানায়।

মালদহের জেলা-পুলিশ-অধিকর্ত্তা আসিলেন থানা পর্য্যবেক্ষণ করিতে। সাক্ষাৎ করিবার জন্য সতীন্দ্রনাথকে সংবাদ দেওয়া হইল। সতীন্দ্রনাথ থানা আফিসে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে বসিবার কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। আত্মাভিমানে আহত সতীন্দ্রনাথ চঞ্চল-বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন।

এই ইচ্ছাকৃত অপমানের প্রত্যুত্তর দিলেন তিনি সম্মুখস্থ টেবিলের উপর সহজভাবে হাঁটু রাখিয়া বসিবার ভঙ্গীতে। ক্রোধে কাটিয়া পড়িলেন পুলিশ-সুপার। ততোধিক ক্রোধে উত্তর দিলেন সতীন্দ্রনাথ।

সুপার হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন—**'I shall kick you out',**

উত্তর হইল—**'I shall give you three kicks in return'** সুপার চমকাইয়া উঠিল।

নিম্নস্থ কর্ম্মচারীর সম্মুখে এরূপ অভাবনীয় অপমান সহ্য

করিতে না পারিয়া পরাক্রান্ত পুলিশ-স্থপার ঝড়ের বেগে অফিস হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

জীবনের প্রারম্ভেই সতীন্দ্রনাথের সহজাত বোধ-শক্তি দ্বারা অনুভব করিয়াছিলেন সমস্ত দেশব্যাপী এক ক্লীবতা, মনের দৈন্য হীনতা আর জাতির কাপুরুষত্ব।

দেশকে যদি আগাইতে হয়, যদি দেশের স্বাধীনতা অর্জন করিতে হয়, তবে চাই সর্ব্বাগ্রে দেশবাসীর মধ্যে তেজ ও দুর্জয় সাহসিকতার অনুশীলন। বিপ্লবী-মন্ত্রের মধ্যে সেদিন সতীন্দ্রনাথ পাইলেন যেন সেই পথেরই সন্ধান।

এই প্রকারের মানসিক প্রস্তুতি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর গঠিত ছিল বলিয়াই আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব-বর্জিত অন্তরীপের বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যেও তিনি এই প্রকারের আত্মিক মনোবলের পরিচয় দিতে সক্ষম হইয়াছিলেন মাত্র বিশ বৎসর বয়সে।

এই ঘটনার ফলে শাস্তিস্বরূপ সতীন্দ্রনাথকে পাঠান হইল জলপাইগুড়ির আলীপুর ডুয়ার্সের একটী নিকৃষ্ট স্থানে। জলপাইগুড়ি জেলার পুলিশস্থপার ছিলেন মিঃ লোম্যান, পরবর্ত্তীকালে যিনি বিশেষ যোগ্য সরকারী পুলিশ-অফিসার রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৯২০ সনের পূর্ব্বে ইংরেজ কর্ম্মচারীদের ব্যবহার স্থানীয় জনসাধারণের প্রতি ছিল অতীব তাচ্ছিল্যজনক। সুতরাং এ প্রকারের মনোবৃত্তিতে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত ইংরেজ পুলিশ কর্ম্মচারী

যখন দুর্গমস্থানে আবদ্ধ একজন বন্দীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন, তখন তাহা কৃপাদত্ত "দর্শন-দান"-রূপ ইহাই তাহাদের ধারণা ;

মিঃ লোম্যান যখন আসিলেন সতীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তখন আশা করিয়াছিলেন যে বন্দী জীবনের কিঞ্চিৎ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য সতীন্দ্রনাথের নিকট হইতে আসিবে প্রার্থনা বা অনুরোধ। তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া গেল। বিস্মিতভাবে মিঃ লোম্যান দেখিলেন ২০।২১ বৎসর বয়সের তরুণ যুবকের অসহ্য স্পর্দ্ধা। প্রার্থনা-অনুরোধের ভাষা সতীন্দ্রনাথের ছিল না। লোম্যানের কাছে তিনি পাইতে চান সমপর্য্যায়ের আসন—সমানে সমানে ব্যবহার ; আর তাঁহার দাবী ছিল দৃঢ়, প্রকাশ-ভঙ্গী ছিল ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক।

ইংরেজ উচ্চ পুলিশ অফিসার কিনা একজন নগণ্য বাঙ্গালী তরুণ বন্দীর সহিত সম-পর্য্যায়ে দাঁড়াইয়া কথা বলিবে ! মিঃ লোম্যানের অহমিকায় আঘাত পড়িল। পরাজয় তিনি স্বীকার করিবেন না, সুতরাং সতীন্দ্রনাথকে সাবধান করিয়া বলিলেন—"You are the most troublesome person I have seen. If you don't correct yourself, the Government will send you to a place where you will suffer the worst."

আত্ম-সম্মানে সচেতন সতীন্দ্রনাথ সমুচিত উত্তর দিয়া বলিলেন—"You may do so, but you will not be able to keep me there more than sixteen days if the place is unfit for living."

মিঃ লোম্যান কথা রাখিলেন। উদ্ধত সতীন্দ্রনাথকে শান্ত করিবার জন্য এবার তাহাকে সুদূর ভুটান সীমানায় কুমারগ্রাম নামক একটী দুর্গমস্থানে অন্তরীণ করা হইল। চতুর্দ্দিক বৃহৎ বন-জঙ্গলে পরিবৃত। সু-উচ্চ পর্ব্বত পথঘাট শূন্য, আবাস-বিরল সে এমন একস্থান, যেখানে যখন তখন বন্য হিংস্র জন্তু জানোয়ারের আনা-গোনা চলে। তাহার উপর স্থানটীও হইল ম্যালেরিয়া-গ্রস্থ। গরু বা মহিষ গাড়ী দ্বারা বাহিরের সহিত যোগাযোগ রক্ষিত হইত। তাহাও আবার বর্ষার সময় বন্ধ :

সাধারণ রক্ত মাংসের মানুষকে এমন জন-মানব বর্জ্জিত দুর্গমস্থানে একলা মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর থাকিতে হইতে পারে এমন সম্ভাবনাও সাধারণ লোককে উন্মাদ করিয়া দেয়। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের চরিত্র গঠিত হইয়াছে শক্ত ভিত্তির উপর। অজানা দুর্গম পথের প্রতি ছিল তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ, সুতরাং বিপদকে বা সঙ্কটকে এড়াইয়া যাইবার পরিবর্ত্তে; উহাকে আবাহন করিতেন নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রস্তুতির জন্য। প্রতি বিষয়কেই তিনি গ্রহণ করিতেন জীবনের পরীক্ষা রূপে। আকাঙ্ক্ষিত বিপদ ও লাঞ্ছনার মধ্য হইতে আহরণ করিতেন তিনি জীবনের প্রকৃত রস। তাঁহার সমগ্র জীবনব্যাপী ছিল এই রসধারার তীব্র আকর্ষণ!

সুতরাং এমন নির্জ্জনস্থানের নির্ব্বাসন বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিবার ন্যায় মানসিক পরাজয় তিনি স্বীকার করিলেন না। সতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষকে

চরম পত্র দিয়া জানাইলেন অবিলম্বে তাঁহার স্থান পরিবর্ত্তন করা না হইলে তিনি স্বেচ্ছায় স্থান ত্যাগ করিবেন।

আজ দীর্ঘ দিবসের ব্যবধানে ধারণা করা বিশেষ কষ্টকর হইতে পারে যে সেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে, একটী অগম্যস্থানে আবদ্ধ তরুণ যুবক এমন কার্য্য করিতে উদ্যত যাহার পরিণতি, গুরুতর লাঞ্ছনার কারণ হইতে পারিত। এমন কি তাঁহার বিষয় বাহিরের কাহারও নিকট সংবাদও পৌঁছাইবার সম্ভাবনা ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান, দৃঢ়-ব্রত সতীন্দ্রনাথের হইল জয়।

তাঁহাকে এবার আলীপুর ডুয়ার্সের একটী অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট স্থানে অন্তরীণ করা হইল।

এই স্থান-পরিবর্ত্তনের সাথে সাথেই সরকারী ব্যবহারও যেন উৎকৃষ্টতর, ভদ্র, স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর হইয়া উঠিল।

মিঃ লোম্যান ছিলেন চতুর পুলিশ অফিসার। কঠোর ব্যবহার দ্বারা পারা গেল না সতীন্দ্রনাথকে আয়ত্তের মধ্যে রাখিতে। এবার আদর-আপ্যায়নের আপাত-মনোরম পথে তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবার প্রচেষ্টা হইল। মিঃ লোম্যান বিশেষ আগ্রহের সহিত প্রস্তাব করিলেন একটী সরকারী উৎকৃষ্ট চাকুরীর। তাহার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিপুণ চিত্র উদ্‌ঘাটন করিলেন সতীন্দ্র নাথের সম্মুখে, কিন্তু কঠোর ব্রত-প্রয়াসী সতীন্দ্রনাথ মুহূর্ত্তের মধ্যেই বিনা দ্বিধায় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন—জয় করিলেন মনের দুর্ব্বলতাকে।

প্রায় দীর্ঘ চারি বৎসরকাল বিভিন্নভাবে বন্দী-জীবন যাপন করিবার পর প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৯ সনে তাঁহার মুক্তির আদেশ হয়।

*   *   *   *

ব্যবসায়ী জীবন

সতীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের মধ্যে মাত্র ৭।৮টি মাস কাটাইয়াছিলেন নিজের অর্থকরী প্রচেষ্টার মধ্যে। বন্দী-অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া নূতনভাবে রাজনৈতিক কার্য্য গ্রহণ করিবার অবসরে তিনি সুরু করিয়াছিলেন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়। অবশ্য অনতিবিলম্বেই উহা সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। ব্যর্থতা আসিল ভবিষ্যৎ সার্থকতর জীবনের পরিপন্থী হইয়া। সকলের জন্য যে সতীন্দ্রনাথ—সীমাবদ্ধ স্বার্থে সে পূর্ণায়িত হইবে কেন?

অহিংস অসহযোগ

মহাত্মা গান্ধী-প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলন—অহিংস্র তার রূপ, অমোঘ তার শক্তি। সে রূপ বিপ্লবীর মনে আনিল এক দারুণ বিপর্য্যয়—প্রত্যয় ও সন্দেহ, আশা ও নিরাশার মধ্যে বিপ্লবীর দল তখন দোদুল্যমান।

কিন্তু সব বাধা অপসারিত হইয়া গেল মহাত্মার অভয়-বাণীর দৃঢ় ইঙ্গিতে। কুয়াশার মধ্যে সে যেন এক নূতন আশার আলোক-রশ্মি—এক নূতনতর পথ-নির্দ্দেশ!

* * * *

গণ-আন্দোলনে

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব ছিল এক বিস্ময়কর ঘটনা। তাঁহার উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বানে সমগ্র ভারতবর্ষের বিক্ষুব্ধ চেতনা যেন কর্ম্মচাঞ্চল্যে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। 'Swaraj in one year,' এক বৎসরেই স্বরাজ অর্জ্জন—দেশকে যেন বিদ্যুতবৎ চমকিত করিল। স্বাধীনতা অনিবার্য্য যদি দেশ তাঁহার ন্যূনতম পন্থাও গ্রহণ করে। তাঁহার কার্য্যের ভিত্তি হইল—অহিংস অসহযোগ এবং স্বদেশী গ্রহণের প্রতীকরূপে চরকা।

গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র,, কর্ম্মনিষ্ঠা, প্রকাশভঙ্গী এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার জ্বলন্ত বিশ্বাসদীপ্ত উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী দেশকে মুহূর্ত্তের মধ্যে একসূত্রে গাঁথিয়া ফেলিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার মানবীয় আদর্শের প্রয়োগ আরও গভীরভাবে দেশকে আকৃষ্ট করিল। বুদ্ধিজীবি হইতে সুরু করিয়া শ্রমজীবি, ধনী হইতে দরিদ্র সমগ্র স্তরের জনসাধারণ শ্রদ্ধার সহিত স্বীকার করিলেন গান্ধীজীকে। গান্ধীজী জনতার মনে আসন বিছাইলেন।

রাজনৈতিক এই পরিবেশ সতীন্দ্রনাথের সম্মুখে এক নূতন পথের সন্ধান দিল। অহিংস অসহযোগের মধ্যে তিনি যেন এক দুর্জ্জয় শক্তির সন্ধান পাইলেন। এই অহিংসার মধ্যে তিনি দেখিলেন তেজ, বীর্য্য ও ভয়হীনতার প্রকাশ—ছিল না ইহাতে কাপুরুষতা বা দুর্ব্বলতার স্থান। অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহযোগ অর্থাৎ অন্যায়কে স্বীকার না করা, এজন্য আসুক বিপদ, আপদ বা লাঞ্ছনা তবু অসহযোগী অন্যায়কে স্বীকার করা চলিবে না। সারা দেশব্যাপী, ক্লীবতা, হীনতা, কাপুরুষতা জয় করিতে হইবে তেজ, বীর্য্য ও ভয়হীনতার মাধ্যমে।

দেশবাসীর ক্ষণলুপ্ত সমবেত প্রচেষ্টার মধ্যে রহিয়াছে যে অসীম শক্তি সুপ্ত উহাকে উদ্বুদ্ধ, জাগ্রত, কর্ম্মমূলক করিবার এক অভিনব কর্ম্মপন্থা যেন উদ্‌ঘাটিত হইল সতীন্দ্রনাথের সম্মুখে। যে প্রচণ্ড কর্ম্মশক্তি সতীন্দ্রনাথের মধ্যে তিল তিল করিয়া সঞ্জীবিত হইতেছিল, উহার এক ব্যাপক প্রকাশের সুযোগ হইল উপস্থিত।

বিপ্লবী যুগান্তর দল গান্ধীজীর প্রদর্শিত এই অসহযোগ আন্দোলনকে শক্তিশালী করিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে একযোগে কংগ্রেসে যোগদান করেন। সুতরাং দলের প্রত্যেক বিপ্লবীর উপর নির্দ্দিষ্ট হইল প্রদেশের বিভিন্ন জিলায় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গণ আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যোগদান করা। সুতরাং সতীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিজ্ঞতার নূতন জীবন সুরু করিলেন। বরিশাল জিলার পটুয়াখালী তাঁহার কর্ম্মস্থল নির্ব্বাচিত হইল। বয়স তখন তাঁহার চব্বিশ বৎসর।

* * * *

কর্ম্মী-নেতা

সতীন্দ্রনাথের সর্ব্ব কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যে নূতনত্ব ও ব্যক্তিত্বের ছাপ থাকিত। তাঁহার চলা, বসা, কথা বলা প্রভৃতির মধ্যেই মূর্ত্ত হইয়া উঠিত এক বুদ্ধিদীপ্ত বীর্য্যবান শক্তি। সুতরাং স্বাভাবিক-ভাবেই তাঁহার সমবয়সী অথবা স্বল্পবয়স্ক তরুণদল তাঁহার প্রতি অদ্ভুতভাবে আকৃষ্ট হইত!

স্বল্পবাক অথচ তেজীয়ান, শিশুর মতন যেমন দরদী, তেমনই ভীরুতা, কাপুরুষতা ও অলসতার তীব্র বিদ্বেষী—আদর্শের উপর যেমন জ্বলন্ত বিশ্বাস তেমনই অন্যায়ের বিরুদ্ধে ছিল ভীষণ ক্রোধ। এই চরিত্রের সংমিশ্রণে গঠিত জীবন অজ্ঞাতসারেই তাঁহার চতুষ্পার্শ্বস্থ তরুণ সমাজের আদর্শ রূপে গৃহীত হইল।

১৯২০ সনে বরিশাল প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় করেন সভাপতিত্ব। ২৪ বৎসর বয়সেই সতীন্দ্রনাথ

নিজস্ব অনুগামী একদল ছাত্র-যুবক স্বেচ্ছা-বাহিনী সহ আসিলেন সম্মেলনের সেবার কার্য্য গ্রহণ করিতে। কঠিন শ্রমসাধ্যকার্য্য তিনি চাহিয়া গ্রহণ করিলেন বটে কিন্তু ক্ষমতায় আসীন কর্ত্তৃপক্ষের অবিবেচনা প্রসূত কার্য্যের ফলে তিনি হইলেন বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ। সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নির্দ্ধারিত উপযুক্ত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে তিনি অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাচ্ছিল্যের সহিত হইল সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত। ন্যায়সঙ্গত ক্রোধে তিনি ছুঁড়িয়া ফেলিলেন তাঁহার স্বেচ্ছা-বাহিনীর যাবতীয় ব্যাজ প্রভৃতি। অন্যায় করা বা অন্যায় স্বীকার করা ছিল না তাহার প্রকৃতির মধ্যে।

চেষ্টা-তদ্বির করিয়া নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত থাকিবারও যে একপ্রকার কায়দা-কানুন থাকিতে পারে, সে জ্ঞান তাঁহার কোনদিনই ছিল না। অন্তরের অসাধারণ কর্ম্ম তৃষ্ণায় ছটফট করিতেন তিনি। সুতরাং বরিশাল জিলা কংগ্রেসের উচ্চস্তরের নেতৃত্বের প্রতি আদৌ দৃষ্টি না রাখিয়া অখ্যাত পটুয়াখালীকেই তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত কর্ম্মস্থল রূপে নির্ব্বাচিত করিলেন।

বঙ্গদেশের এক দুর্গমস্থান হইল পটুয়াখালী মহকুমা। সমগ্র বরিশাল জিলায় রেল-সংযোগ ছিল না, ইহার উপর পটুয়াখালী মহকুমার ৭টি থানার সহিত ছিল না যোগাযোগের কোন উপযুক্ত রাস্তা-পথ। চতুর্দ্দিকের বিশাল নদী, খাল বিল প্রভৃতির মাধ্যমে চলিত যোগাযোগ। নৌকাযোগে চলিতে হইলেও নির্ভর করিতে হইত জোয়ার-ভাঁটার উপর। জন-সংখ্যায়

মুসলমান সম্প্রদায় ছিল শতকরা ৯৫ জন। আবশ্যকীয় সংবাদ কলিকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া একেবারে অসম্ভব না হইলেও বাস্তবক্ষেত্রে ছিল বিশেষ কঠিন ব্যাপার।

দেশের এরূপ এক অংশেই গণ-আন্দোলন সৃষ্টির দায়িত্ব তিনি সানন্দে গ্রহণ করিলেন। পরিকল্পনামত সমগ্র থানায় এবং বিশিষ্ট বন্দরে কংগ্রেস ও খিলাফৎ আফিস স্থাপন করিয়া সেই সব অফিসের পরিচালনার ভার দিলেন তাঁহার সঙ্গী শিক্ষিত তরুণ সেবকগণের উপর। প্রত্যক্ষ কর্ম্ম হইল বিদেশী-দ্রব্য-বর্জ্জনের আন্দোলনকে বেগবান করিয়া তোলা। এইজন্যই আবশ্যক এক বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সংগঠন। সুশৃঙ্খল এরূপ এক বিরাট স্বেচ্ছাবাহিনী জাতীয় আন্দোলনের চরম মুহূর্ত্তে আগাইয়া যাইবে আইন অমান্য সংগ্রামের সম্মুখভাগে—ইহাই ছিল সতীন্দ্রনাথের কল্পনা।

পত্রিকায় প্রচার পত্র বা সভা-সমিতি দ্বারা এরূপ দুর্গম ও বিস্তৃত এলাকায় গণ-আন্দোলন প্রচার করা ছিল একপ্রকার অসম্ভব ব্যাপার। সতীন্দ্রনাথ নূতনত্বের উদ্ভাবক—অসম্ভব বলিয়া তাঁহার কাছে কিছু ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট একটী বিশিষ্ট পন্থার উপযুক্ত সুযোগ তিনি গ্রহণ করিলেন।

সমগ্র মহকুমার বিভিন্ন স্থানের বহু সাপ্তাহিক হাটে, কেনা-বেচার প্রয়োজনে উপস্থিত হইত সহস্র সহস্র পল্লীবাসী। সতীন্দ্র নাথ সেই হাটগুলোকেই প্রচারের উপযুক্ত কেন্দ্র বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কাজও আরম্ভ করিলেন আকর্ষণীয় রূপে।

যখনই যে কর্ম্ম তিনি গ্রহণ করিতেন উহাতে অর্পণ করিতেন তাঁহার মন, প্রাণ এবং সর্ব্বশক্তিসহ একাগ্রতা। সুতরাং কর্ম্মের সহিত হইত মর্ম্মের মিলন, কর্ম্মের মধ্যে আসিত ধর্ম্মের নিষ্ঠা। ফলে অনায়াসেই উদ্‌ঘাটিত হইত কর্ম্ম-পন্থা। নাটকীয় আকর্ষণে সে পথ জয়ের দিকেই অগ্রসর হইত।

বয়স সতীন্দ্রনাথের ছিল অল্প কিন্তু লোক-চরিত্র জ্ঞান ছিল গভীর। কাজেই তিনি চাহিলেন কর্ম্মের আবেগ ও উন্মাদনা-সৃষ্টি, যাহার বাস্তব আবেদনে সাড়া জাগিবে সাধারণ জনতার মধ্যে বিপুল উৎসাহে।

হিন্দু, মুসলমান, বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতির যোগে সংগঠিত শতাধিক স্বেচ্ছা-সেবকের এক একটী দল প্রেরিত হইত দূর দূরান্তরের বিভিন্ন হাটে। পথ ঘাট পাওয়া গেলে ভাল, নচেৎ অজানা মাঠ-ঘাট-প্রান্তরের অভ্যন্তরেই পথ সৃষ্টি করিয়া চলিবার থাকিত নির্দ্দেশ। আহারের ব্যবস্থা পূর্ব্বাহ্ণ হইতে আয়োজিত না থাকিলেও—স্বেচ্ছা-বাহিনীর কার্য্যের সফলতা প্রমাণিত হইত তাঁহাদের আহার্য্য সংগ্রহের মধ্যে। জন-সাধারণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত দান পাইবার মত সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার ন্যায় কর্ম্মশক্তির পরিচয় হইত তাহাতেই ব্যক্ত।

জাতীয় কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটির পতাকাসহ সমবেত কণ্ঠের জাতীয় সঙ্গীত এবং মাঝে মাঝে জাতীয়-ধ্বনির আওয়াজ সহকারে শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বেচ্ছা-বাহিনীর পথ-পরিক্রমা চতুর্দ্দিকে এক নূতন বিস্ময় সৃষ্টি করিত। বিস্ময় হইতে আসে কৌতূহল, এবং

কৌতূহল আকর্ষণ করে যুক্তি। যুক্তি গ্রহণ করিবার মত মানসিক প্রস্তুতি যখন আসে, আদর্শ প্রচারের হয় তখন উপযুক্ত সময়।

যখন সমগ্র মহকুমার ছিল জনসাধারণের অধিকাংশ অশিক্ষিত —শতকরা ৯৫ জনই বলিতে গেলে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত,— অর্দ্ধ ডজনও উচ্চ শিক্ষিত বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী পাওয়া যায় না—তখন জনসাধারণকে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করাই তো প্রকৃত কাজ!

ছোঁয়াচে রোগের মত কর্ম্মের উন্মাদনা ব্যাপকতা প্রাপ্ত হয় নূতন নূতন কর্ম্মের প্রেরণার মধ্যে—সুতরাং অজ্ঞ অশিক্ষিত ও বিস্মৃত জনসাধারণের নিকট প্রচারিত জাতীয় দাবী এবং বিদেশী বর্জ্জনের যুক্তিতর্কের আবেদনের মধ্যে এক নূতন গণ-চেতনার আভাস পাওয়া যাইত। ফলে, দলে দলে শত শত মুসলমান তরুণ যুবক যোগদান করিতে থাকিল স্বেচ্ছা-সেবক দলে। জাতীয় আন্দোলনের ক্রম-প্রস্তুতি যেন এক নূতন প্লাবনের সৃষ্টি করিতে লাগিল।

* * * *

গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড

সমস্ত ভারতবর্ষে অসহযোগ আন্দোলনের অভূতপূর্ব্ব বিস্তৃতি বৃটিশ সরকারকে করিল শঙ্কিত। অহিংস আন্দোলনকে হিংস্র-ভাবে পঙ্গু করিয়া দিবার ক্ষমতা থাকিতেও জগতের লোকের সম্মুখে উহার প্রয়োগ করিতে প্রথম প্রথম সঙ্কোচ বোধ ছিল সরকারের। কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই বৃটিশ সরকার দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটাইয়া তাহার রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিল।

কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ফলে দেখিতে দেখিতে সহস্র সহস্র কংগ্রেস কর্ম্মী হইলেন বন্দী। কাজেই সতীন্দ্রনাথকেও করা হইল গ্রেপ্তার। বিচার হইল এক তরফা অর্থাৎ সতীন্দ্রনাথ আদালতের বিচার স্বীকার করিলেন না। শাস্তি ঘোষণা করা হইল—আড়াই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

সতীন্দ্রনাথ হইলেন বন্দী। বন্দী সতীন্দ্রনাথের হস্তযুগল রহিল হ্যাণ্ডকাপে আবদ্ধ, আবদ্ধ হইল তাঁহার কটিদেশ পুলিশ-ধৃত রজ্জুতে। দণ্ডপ্রাপ্ত সতীন্দ্রনাথকে পাঠান হইল বরিশাল ডিষ্ট্রিক্ট জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিবার জন্য।

* * * *

বরিশাল জেলে

সাধারণ কয়েদীর বেশে সতীন্দ্রনাথ আসিলেন বরিশাল জেলে। জেল সুপার ছিলেন তখন ডাঃ মেজর মুনরো—যুদ্ধ ফেরতা জবরদস্ত অফিসার।

প্রথম সাক্ষাতেই বাধিল সংঘর্ষ! বাদ প্রতিবাদ ঘটিল মুনরো ও সতীন্দ্রনাথে। মুনরো স্তম্ভিত হইয়া গেল বন্দীর স্পর্দ্ধা দেখিয়া। সাধারণ বন্দী যে, সে কিনা জেল সুপারের সহিত মুখের উপর করে তর্ক! সতীন্দ্রনাথ শুধু এইটুকু বুঝাইবার চেষ্টাই করিয়াছিলেন যে সাধারণ কয়েদী এবং রাজনৈতিক কয়েদীর মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে বিস্তর। একথা শুনিবার অবসর ছিল না মিঃ মুনরোর—তাহার নিকট কয়েদীর একমাত্র অর্থ হইল—

"কয়েদী"—অপরাধী বন্দী মাত্র সে। অন্য কোন অর্থ তাহার নিকট নাই। সুতরাং জেল আইনের সর্ব্বপ্রকার নিয়মকানুন নিষ্ঠার সহিত পালন করিবার জন্য হুকুম দিলেন মিঃ মুনরো।

জেলের ডোড়াকাটা জাঙ্গিয়া ও ফতুয়া পরিহিত, মস্তকে জেল টুপী,, বুকের বস্ত্রের উপর আটকান চামড়ার চাকতীতে উৎক্ষিপ্ত বন্দীর নির্দ্দিষ্ট ক্রমিক সংখ্যা, হস্তে—একদিকে থালা-বাটি অপরদিকে প্রকাশমান জেল-পঞ্জী বা টিকিট। এরূপ পরিপাটি বেশে কয়েদী দলের সারিবদ্ধভাবে থাকিতে হয় জেল-সুপার বা অন্য পরিদর্শকের অপেক্ষায়। প্রতিদিন যখন সুপার তাহার বৃহৎ দলবলসহ সামন্ত-তান্ত্রিক ভঙ্গীতে বৃহৎ এক ছত্র শোভিত পরিবেশে কয়েদীদলের সম্মুখে উপস্থিত হ'ন,—তখন পূর্ব্ব ব্যবস্থানুযায়ী কোন সিপাহী চীৎকার করে—'সরকার সেলাম'। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধবৎ কয়েদীর দল একযোগে দণ্ডায়মান হইয়া সুপারকে করে সেলাম। সুপার যখন পরিদর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইবেন, তখন কোন কয়েদীর অধিকার ছিল না তাহার ভূমী-ন্যস্ত চক্ষুযুগল তুলিয়া সুপারের দিকে তাকাইবার। প্রত্যেক কয়েদীর নিজ নিজ নির্দ্ধারিত কঠোর শ্রমের অবসরে তাহাদের দৈনিক স্নানাহার, মলমূত্র ত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে হইত সারিবদ্ধভাবে ও আদেশ মত।

সুতরাং জেল-সুপার মিঃ মুনরো চাহিলেন রাজনৈতিক কয়েদীদের এমনই কঠোর বন্ধনেই রাখিতে হইবে, জেল জীবনকে নিয়ন্ত্রিত রাখিতে। শক্তিমান জবরদস্ত সুপার বিশ্বাস করিলেন না

যে, কোনো কয়েদী তাহার আদেশ অমান্য করিতে পারে। বিশেষত্বহীন কতগুলি রাজ-নৈতিক ক্ষীণদেহ বাঙ্গালী কয়েদীকে দাবাইয়া রাখা যেন তাহার নিকট কোন সমস্যার ব্যাপারই নয়—এই বিশ্বাসেই তিনি চলিলেন অগ্রগতিতে।

১৯২১ সনের কারা জীবনের পরিবেশ এইরূপই ছিল সর্ব্বত্র।

সতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে এই মতই নির্দ্ধারিত হইল যে—রাজনৈতিক কয়েদী হিসাবে জেল-কর্ত্তৃপক্ষকে অহেতুক কোন প্রকার অসম্মান প্রদর্শন করা হইবেনা বটে, কিন্তু জেল-কর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্ধারিত অবমান-সূচক কোন বিধি-নিয়মও স্বীকার করা হইবে না। রাজবন্দীগণ এই আদর্শনীতি স্থির করিয়া লইলেন।

পরদিবস রাজনৈতিক কয়েদীদের ব্যারাকে আসিলেন সুপার মিঃ মুনরো। প্রত্যেক রাজনৈতিক বন্দী ছিলেন নিজ নিজ আসনে উপবিষ্ট। জেল সিপাহী হুঙ্কার দিয়া উঠিল—'সরকার সেলাম'। সব নিস্তব্ধ, কেহই সারিবদ্ধভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন না। ক্রুদ্ধ সুপার হুকুম দিলেন 'Let them be compelled to stand'—"জোর করে দাঁড়া করাও"।

সুরু হইল ধ্বস্তা-ধ্বস্তি। ব্যর্থ মনোরথ মুনরো ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় ব্যারাক ত্যাগ করিলেন।

অবিলম্বে সতীন্দ্রনাথকে করা হইল নির্জ্জন কুঠুরীতে আবদ্ধ। হয়তো মুনরো ভাবিলেন নেতাহীন দলকে সম্ভব হইবে আয়ত্তে আনিতে। কিন্তু সে আশাও তাহার চূর্ণ হইল।

প্রতিদিন যেমন চলিতে লাগিল এইসব রাজনৈতিক

কয়েদীদের উপর জেল পুলিশ কর্তৃক জোর-জবরদস্তিতে 'সরকার সেলাম' স্বীকার করাইবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা—তেমনই তাহাদের আদেশ অমান্যও হইয়া চলিল সমভাবে।

অবশেষে সুরু হইল অত্যাচারের পালা—বাছিয়া বাছিয়া বন্দীদের দেওয়া হইল বিভিন্ন কারা-শাস্তি। **Hand cuff, Day hand cuff, Night hand cuff, Bar-fetters, standing hand cuff, Night standing hand cuff. Cross Bar fetters, Gunny clothes, Penal diet, Cell punishment.**—অর্থাৎ হাত-কড়ী, দেয়ালে আবদ্ধ হাতকড়ী, রাত্রে হাতকড়ী, রাত্রে দাঁড়ান হাতকড়ী, বেড়ী, ডাণ্ডা-বেড়ী, হাতকড়ী অবস্থায় ডাণ্ডাবেড়ী, চটের বস্ত্র, স্বাভাবিক খাদ্যের পরিবর্ত্তে খুদ ও নুনের লাপসী, এবং নির্জ্জন কুটুরী-বাস—একের পর এক এই সব শাস্তি কিস্তিতে কিস্তিতে চলিতে লাগিল বিভিন্ন রাজনৈতিক বন্দীর প্রতি। যাদের প্রতি এই শাস্তি প্রয়োগ হইতেছিল সেই সব বন্দীগণ যেন মহা উৎসাহেই সে শাস্তি গ্রহণ করিল—না ছিল কোন ক্ষোভ বা অবসাদের লক্ষণ। বরং আনন্দের আবেগেই তাহারা গাহিত :—

"শিকল ভাঙ্গা ছল মোদের এই
শিকল ভাঙ্গা ছল
এই শিকল পরেই শিকল তোদের
করবোরে বিকল।"

মিঃ মুনরোর আদেশ এই ভাবেই হইল অগ্রাহ্য।

নূতন অত্যাচারের ব্যবস্থা হইল। রাজনৈতিক বন্দীদের নিজস্ব ব্যারাক তুলিয়া সমুদায় বন্দীদের ছড়াইয়া রাখা হইল সাধারণ কয়েদীদের বিভিন্ন ব্যারাকে। সমবেত প্রতিরোধ শক্তির অবসান এবার নিশ্চয়ই হইবে—ইহাই ছিল ধারণা। সাধারণ কয়েদীদের প্ররোচিত করা হইল এই সব বন্দীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মিঃ মুনরোর শাসন ব্যবস্থাকে করা হইল সম্পূর্ণ-রূপে অস্বীকার। সশ্রম দণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদীগণ এবার তাদের উপর নির্দ্ধারিত জেলের প্রদত্ত যাবতীয় কার্য্য করিল বন্ধ। জেল-অভ্যন্তরে সুরু হইল অসহযোগ আন্দোলনের নূতন রূপ। কত শাস্তি মিঃ মুনরো দিতে পারে এবার হইবে যেন তাহারই পরীক্ষা। বন্দীরা রহিলেন অটুট সংকল্পে দৃঢ়ব্রতী।

এদিকে কঠোর পাহারায় রক্ষিত নির্জ্জন কক্ষে আবদ্ধ বন্দী সতীন্দ্রনাথের সহিত জেল সুপারের চলিতেছিল তীব্র সংঘর্ষ।

মিঃ মুনরো গর্জিয়া বলিলেন—'I shall have them suppressed.'

উত্তরে সতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"তা কখনও পারবে না।"

জেল সুপারের সহিত সাক্ষাৎ হইতে না হইতেই সতীন্দ্রনাথ রাজনৈতিক কয়েদীদের উপর বর্ষিত বিভিন্ন শাস্তির শেষ সংবাদ বলিয়া যাইতেন মুনরোর নিকট। অবাক বিস্ময়ে মুনরো হইতেন স্তব্ধ। কি করিয়া সম্ভব হয় এই প্রকারের সংবাদ সংগ্রহ করা! সিপাহী পাহারার ব্যবস্থা হইল আরও কঠোর—কোন প্রকারেই যেন বাহিরের সহিত কক্ষে আবদ্ধ সতীন্দ্রনাথের

কোন সংযোগ না থাকে। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের যোগাযোগের ব্যবস্থা রহিল অটুট। মিঃ মুনরো ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন।

অত্যাচারের মাত্রা এবার শেষ পর্য্যায়ে উপস্থিত হইল। সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে রক্ষিত রাজনৈতিক বন্দী-দের অটুট মনোবলের উপর আসিল এক কঠিন পরীক্ষা। সতীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাহির করা হইল গিরিজা মুখোপাধ্যায়, মকুবুল মিঞা ও রাজেন দাসকে। হুকুম হইল উন্মুক্ত স্থানে হস্ত পদ আবদ্ধ রাখিয়া নগ্ন দেহের উপর ঘাতক কর্তৃক নিষ্ঠুর বেত্রাঘাত।

আয়োজন প্রস্তুত—ঔষধাদি সহ ডাক্তার উপস্থিত। সুরু হইল একের পর এক কঠোর বেত্রাঘাত, আঘাতের উপর কঠিন আঘাত। "বন্দেমাতরম" ও "আল্লা হো আকবর" বলিতে বলিতে তিনটি যুবক জ্ঞানহীন ভাবে ঢলিয়া পড়িল কাঠগড়ার উপর।

সমগ্র জেল স্তব্ধ ও নিশ্চল। যেন একটা ভয়ানক ঝঞ্ঝা আগতপ্রায়। রাজনৈতিক বা সাধারণ কয়েদীদের বিক্ষুব্ধ অন্তরের মধ্যে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকাইয়া গেল। ভয় এবং অভয়ের দূরত্ব গেল কমিয়া।

* * * *

প্রথম অনশন

পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় সতীন্দ্রনাথ সমস্ত রজনী তাঁহার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে করিলেন পদচারণ। গভীর আবেগে অন্তরের সহিত পুনরায় করিলেন নিজকে যাচাই। এই যে অত্যাচার এই যে

নিষ্ঠুর মন্থনের হলাহল, তাহা ধারণ করিবার জন্য নীলকণ্ঠের সে শক্তি কি তাহার নাই ?

জীবনকে পণ করিয়া উত্তর দিলেন সতীন্দ্রনাথ, ঘোষণা করিলেন যতক্ষণ না মিঃ মুনরোকে করা হয় স্থানান্তরিত এবং এই অত্যাচার না হয় বন্ধ, তিনি আর অন্ন গ্রহণ করিবেন না।

মদগর্ব্বে উন্মত্ত বলীয়ান মুনরো পুনরায় করিলেন শেষ বারের ন্যায় ভুল। মুনরো তো জানে না—আত্মিক-শক্তিতে যাঁরা বলীয়ান তাদের দৈহিক বল দ্বারা পরাজিত করা যায় না।

অনশন চলিতে লাগিল—দিন যায়, সপ্তাহ যায়, মাস আগত প্রায়—সতীন্দ্রনাথ রহিলেন অটল ও দৃঢ়।

ডাক্তারী মতে আর নিশ্চেষ্ট থাকা চলে না। সতীন্দ্রনাথের পাকস্থলীর মধ্যে তরল খাদ্য প্রবেশ করাইতেই হইবে।

বজ্র কঠিন দেহের অধিকারী সতীন্দ্রনাথের দেহ যেন ক্রমশঃ শুষ্ক ও ক্ষীণ হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক হইল সতীন্দ্রনাথকে জোর পূর্ব্বক আহার করান হইবে। জেল-সিপাহী দ্বারা বীর-বিক্রমে সতীন্দ্রনাথের দুর্ব্বল দেহকে চাপিয়া ধরা হইল। কঠিন গ্যাগ দ্বারা তাঁহার মুখ গহ্বর উন্মুক্ত করিবার প্রবল প্রচেষ্টা চলিল, কিন্তু সব চেষ্টাই হইল ব্যর্থ। অবশেষে তাঁহার দুর্ব্বল দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস-নালীর মধ্যে বৃহৎ রবারের নল জোর পূর্ব্বক প্রবিষ্ট করান হইল, এবং ইহার দ্বারা পাকস্থলীতে প্রবেশ করান হইল তরল খাদ্য-সার।

এই স্নায়ু-বিধ্বংসী তাণ্ডব ব্যবস্থার পরিশেষে সতীন্দ্রনাথ

কিয়ৎক্ষণ থাকিতেন জ্ঞানহারা অবস্থায়। জ্ঞান ফিরিয়া আসিবার পর গলায় আঙ্গুল প্রবেশ করাইয়া খাদ্যাংশ উদ্গীরণের চেষ্টা করিতেন। সে খাদ্যাংশটুকুও যেন তাঁহার কাছে বিষ।

সাধারণ কয়েদীদের মধ্যে রাজনৈতিক কয়েদীদেরও একত্রে রাখিয়া রাজনৈতিক বন্দীদের সমবেত শক্তিকে চূর্ণ করাই ছিল জেল কর্ত্তৃপক্ষের আশা। কিন্তু ফল সুরু হইল অন্যপ্রকার। সাধারণ কয়েদীরাও মানুষ, তাই তাহারা অবাক হইয়া শুধু ভাবিত রক্ত-মাংসের মানুষ এমন কী শক্তিতে বলীয়ান হইতে পারে যে কারাগারের অভ্যন্তরে ও লোকচক্ষুর অগোচরে নিরস্ত্র মুষ্টিমেয় কতিপয় তরুণ যুবক নির্ম্মম জেল কর্ত্তৃপক্ষকে করিতেছে অস্বীকার! শাস্তি, লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের মাত্রা যত হইতেছিল বৃদ্ধি, প্রতি-রোধ শক্তিও হইতেছিল তত দৃঢ়।

সাধারণ কয়েদীদেরও রক্ত বুঝি তপ্ত হইয়া উঠে—! মানবীয় চেতনা তাহাদেরও ক্ষণিকের তরে বুঝি জাগ্রত হয়।

শত শত সাধারণ কয়েদীদের নিকট এই অসম্মান-সঙ্ঘাত ছিল—অভূতপূর্ব্ব, তাহাদের কল্পনার বাহিরে। অবাক বিস্ময়ে তাহারা যেন ক্রমশঃ রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি হইল বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট।

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! একবেলা আহার না পাইলে, যে মানুষ যাতনায় হয় অস্থির, দেহধারী তেমনই একটী মানুষই আজ কি প্রকারে দিনের পর দিন সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসাধিককাল যাবৎ রহিয়াছেন সম্পূর্ণ অনশনে—সম্পূর্ণ খাদ্যহীন। সতীন্দ্রনাথ মানুষ নয়—তিনি দেবতা, তিনি ফকীর।

দেবতা ফকীর রহিয়াছেন অনশনে, নিরাহারে—এ যে ভীষণ অমঙ্গলের লক্ষণ। চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল সমগ্র কারাগার।

জেল সুপার মুনরোর সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিয়াও আসিল না জেলের স্বাভাবিক শৃঙ্খলা। বরং বিশৃঙ্খলা ক্রমে বাড়িয়াই চলিল। এমন কি এই বিশৃঙ্খলার লক্ষণ যেন ব্যাপকতর-রূপে সমগ্র জেলখানার কয়েদীদের মধ্যেও বিস্তৃতিলাভ করিতেছিল।

ভয়াবহ কল্পনায় প্রাদেশিক সরকার এবার যেন জাগ্রত হইলেন। গণ আন্দোলনের পরিবেশে কারাগারের অভ্যন্তরেও যে আবার আইন অমান্য চলিতে পারে—ইহা ছিল নূতন অভিজ্ঞতা। সুতরাং এরূপ অবস্থাকে আর বেশীদূর অগ্রসর হইতে দেওয়া প্রাদেশিক সরকার সমীচীন বোধ করিলেন না।

উচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে জেল সুপার মিঃ মুনরোকে করা হইল অন্যত্র বদলি, নূতন জেল-সুপার হইল নিযুক্ত।

নূতন সুপারের আগমনের সাথে সাথেই সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার-লাঞ্ছনার হইল অবসান, রাজনৈতিক বন্দীদের আনা হইল স্বতন্ত্র ব্যারাকে। তাহাদের জেল জীবনের ন্যায়সঙ্গত দাবী সমূহ নূতন পরিবেশে হইল গৃহীত। ৬১ দিন পর সতীন্দ্রনাথের অনশন ব্রতের হইল পরিসমাপ্তি। তাঁহার আত্মিক জয় হইল স্বীকৃত।

এই সংঘাতের মধ্যে বিশেষভাবে প্রতীয়মান হইল তাঁহার প্রতি তাঁহার সহযোগী ও অনুগামী সহযাত্রীদের কী গভীর প্রীতি ও আস্থা। বয়স তাঁহার ছিল এই সময়ে পঁচিশের কোঠায়,

কিন্তু যে দুর্লভ ব্যক্তিত্বের অধিকারী তিনি ছিলেন এই সময়ে—তাহার মূলে ছিল সর্ব্বপ্রকার বিপদ আপদের মুখে নিজেকে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার আত্মসমর্পণ। বীরত্ব, ত্যাগ ও সহিষ্ণুতার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তাঁহার সহকর্ম্মীগণ দেখাইয়াছিল তাহা অতীব গৌরবের। বিশেষভাবে উল্লেখ করা চলে কলসকাঠির কানাইলাল ও নলিনী দত্ত, বাউফলের ফক্কু মিঞা, কোষাবরের জিতেন দত্ত, মহেন্দ্র রায়, বিহারী বিশ্বাস প্রভৃতি তরুণদের নাম। ব্রত-উদ্‌যাপনের জন্য স্বেচ্ছায় যে লাঞ্ছনা তাঁহারা বরণ করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসময়ের জন্য উত্তরকালে জগতের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে আদর্শ-রূপে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

* * * *

বিশেষ শ্রেণীর বন্দী

অনতিকাল পরেই সতীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করা হইল প্রথমে কলিকাতার আলীপুর সেণ্ট্রাল জেলে, পরে বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলে বিশেষ শ্রেণীর বন্দীরূপে। উৎকৃষ্ট আহার, উন্নত ব্যবহার, উত্তম শয্যা, খাট, তোষক, মশারী, কাপড় জামা, চেয়ার টেবিল প্রভৃতি দেওয়া হয় বিশেষ-শ্রেণীর বন্দীদের। শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও কোন অভাব নাই। বাংলা দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের জন্য ছিল এই বিশেষ ব্যবস্থা। সুতরাং এই প্রকার স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে আসিয়া সতীন্দ্রনাথ বিহ্বল হইলেন।

সতীন্দ্রনাথ ভীত হইলেন জেল জীবনের এই উৎকৃষ্ট আয়োজন দৃষ্টে। ভাবিলেন একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ শত শত সহকর্ম্মীসহ তিনি

একই অপরাধে হইলেন বন্দী, অথচ জেল জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রায় রহিবে এতদূর ব্যবধান! তাঁহার নিজের জেল জীবন থাকিবে সুখ-বিলাসী আর তাঁহার সহকর্ম্মীদের ব্যবস্থা হইবে রুক্ষ, কঠোর, ক্লান্তিকর! সতীন্দ্রনাথের সদা-জাগ্রত আত্মসম্মানে পড়িল আঘাত। অন্য কোন যুক্তি-চিন্তার অবসর না দিয়া সরল, স্পষ্ট মনে তিনি অস্বীকার করিলেন বিশেষ শ্রেণীর সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সুযোগ ও সুবিধা,—গ্রহণ করিলেন যাহা সাধারণ কয়েদীদের প্রাপ্য।

বহরমপুর ডিষ্ট্রিক্ট জেলকে তখন করা হইয়াছিল বিশেষ শ্রেণীর বন্দীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থারূপে। বাংলা দেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা ও কর্ম্মীদের এখানে রাখা হইত। সুতরাং রাজনৈতিক উচ্চস্তরের নেতৃবৃন্দের সমবেত জীবনযাত্রার স্বাভাবিক-গতি হইতে নিজকে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিচ্যুত রাখিবার মতন সৎসাহস, তেজস্বীতা বা কৃচ্ছসাধনার কোন অভাবই সতীন্দ্রনাথের ছিল না। যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে, যে রকম অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন, তাহা হইতে বিচ্যুত কখনও তিনি হন নাই।

* * * *

কবি নজরুলের সান্নিধ্যে

১৯২১—২২ সনের অসহযোগ আন্দোলনের রাজনৈতিক বন্দীদের সহিত জেলের সাধারণ যথার্থ অপরাধী কয়েদীদের সম-ব্যবহারের প্রতিবাদে তীব্র অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতেছিল সমগ্র

দেশে। বিভিন্ন জেলের কর্ত্তৃপক্ষের সহিত চলিতেছিল নানা প্রকারের সংঘর্ষ। তাঁহারা আইনের চক্ষে কয়েদী হইলেও রাজনৈতিক কারণে বন্দী সুতরাং স্বাভাবিক মর্য্যাদা পাইতে বাধ্য।

সমগ্র দেশে রাজনৈতিক বন্দীদের মধ্যে এক নূতন কূটনৈতিক-সমস্যা দেখা দিল।

একদিন সংবাদ আসিল যে কাজী নজরুল প্রভৃতি অনশন সুরু করিয়াছেন। এই সংবাদ সতীন্দ্রনাথকে করিল চঞ্চল। রাজনৈতিক কয়েদীদের প্রতি—তথাকথিত প্রচলিত ব্যবহার—সমগ্র রাজনৈতিক কয়েদীদের মর্য্যাদার সমস্যারূপে সতীন্দ্রনাথের অন্তরকেও করিতেছিল বিক্ষুব্ধ, সুতরাং অবিলম্বে করিলেন তিনি মনস্থির। জেল কর্ত্তৃপক্ষকে জানান হইল অনতিবিলম্বে তাহাকে পাঠান হউক হুগলী জেলে নচেৎ এখানেই তিনি সুরু করিবেন সহানুভূতি-সূচক অনশন সংগ্রাম।

সতীন্দ্রনাথের চরিত্র জানা ছিল জেল কর্ত্তৃপক্ষের। কাজেই তাঁহার ইচ্ছানুসারেই তাঁহাকে হুগলী জেলে পাঠাইবার দ্রুত ব্যবস্থা হইল, বিপ্লবী সতীন্দ্রনাথ বিদ্রোহী কবির পার্শ্বে বসিয়া অনশন সুরু করিলেন। বন্দী সতীন্দ্রনাথের এও এক বিজয়!

পিতা ৺নবীন চন্দ্র সেন

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺শৈলেন্দ্র বিহারী সেন

মধ্যম ভ্রাতা ৺নগেন্দ্র বিহারী সেন
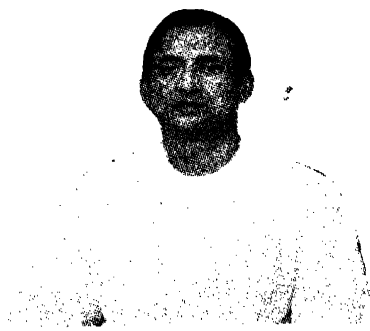
তৃতীয় ভ্রাতা ৺সতীন্দ্র নাথ সেন
(৪৬ বর্ষ বয়সে)

মুক্তি ও পুনর্গঠন

১৯২৩ সনের প্রথম দিকে কারাগার হইতে মুক্ত হইয়া সতীন্দ্রনাথ দেখিলেন পরিবর্ত্তিত এক নূতন রাজনৈতিক পরিবেশ।

চৌরি-চৌরার ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় গান্ধীজী যখন আইন অমান্য আন্দোলন পরিত্যাগ করিলেন তখন সমগ্র প্রদেশে দেখা দিল এক অবসাদ—স্তব্ধতা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বকীয় ব্যক্তিত্বে এহেন এক সঙ্কটময় পরিবেশে দেশের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন এক নূতন কর্ম্মনীতি। আইন সভার ভিতর হইতে বৃটিশ শক্তিকে পর্যুদস্ত করিবার জন্য গঠিত হইল স্বরাজ্য দল। সমগ্র দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হইল এই কর্ম্মনীতি।

রাজনৈতিক এই অবস্থায় সতীন্দ্রনাথ আসিলেন তাঁহার কর্ম্ম-স্থল পটুয়াখালীতে, ব্যথিত চিত্তে দেখিলেন চতুর্দ্দিকের অবসাদ ও নৈরাশ্যের ছায়া। তাঁহার বিশিষ্ট বিশিষ্ট সহকর্ম্মীদের অনেককেই আর দেখিতে পাইলেন না কর্ম্মক্ষেত্রে। সর্ব্বোপরি তাঁহার বিশ্বস্ত মুসলমান কর্ম্মীগণের আর কাহাকেও তিনি পাইলেন না।

এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে আবার নূতন করিয়া কার্য্য-সূচনা সম্ভবতঃ তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। তিনি আত্মবিশ্বাসে পুনর্গঠনের কার্য্য সুরু করিলেন। প্রথমেই তাঁহারই স্বীয় প্রেরণায় স্থাপিত পটুয়া-

খালী জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য একখণ্ড জমি নামমাত্র মূল্যে ক্রয় করিয়া তাহারই উপর নিজস্ব বিদ্যালয়ের ভবন নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। প্রয়োজনীয় অর্থের যখন বিশেষ অভাব হইল তখন তিনি নিজেদের কায়িক শ্রম দ্বারা যতটা অর্থ বাঁচান চলে তাহার ব্যবস্থা করিলেন। প্রতি ছাত্র ও প্রতি যুবক মহা উদ্যমে বিদ্যালয় গৃহের জন্য টিন কাঠ প্রভৃতি নিজেরাই বহন করিয়া আনিলেন। মিস্ত্রীর কার্য্যের সহিত যোগদান করিয়া শ্রমিকের দরুণ যে ব্যয় তাহা বন্ধ করা হইল—প্রশস্ত গৃহের মাটির ভিত শ্রমিক দ্বারা না করাইয়া নিজেরাই মহা উৎসাহের সহিত সম্পাদন করিলেন। শীতের প্রত্যূষে—৪ ঘটিকা হইতে সকাল ৭ ঘটিকা এবং অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা হইতে রাত্র ৯ ঘটিকা পর্য্যন্ত এই মাটি কাটার অপূর্ব্ব দৃশ্য বিশেষ দর্শনীয় ছিল।

এই কার্য্যাবলীর মধ্যে মান-অপমানের তো কোন প্রশ্নই ছিল না বরং যেন উপভোগ্য এক অবর্ণনীয় নিষ্ঠা ছিল সকল কার্য্যে।

বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মাণের পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তিনি নিজে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করেন উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে। এই বিদ্যালয়ের তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন তাহার জ্যেষ্ঠ এক ভ্রাতা—আপন জ্যেষ্ঠতাতের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র সেন।

১৯২৪ সনে বরিশাল জিলা সম্মেলন আহ্বান করা হয় পিরোজপুর মহকুমায়। পিরোজপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ত্যাগব্রতী অনন্তকুমার সেন, বিশিষ্ট কর্মী মৃন্ময় গুপ্ত, প্রভৃতির উদ্যোগে উক্ত সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ১৯২০ সনের পর জিলার সমগ্র কর্ম্মীদের মিলনের ব্যবস্থা হইল। সতীন্দ্রনাথ আসিলেন পিরোজপুরে।

এদিকে পটুয়াখালী হইতে সতীন্দ্রনাথের ব্যবস্থায় প্রায় শতাধিক তরুণ ও ছাত্রদল শ্রীজগদীশ সরকার এবং শ্রীমদনবিহারী চক্রবর্ত্তীর পরিচালনায় পদব্রজে আসিয়া পৌঁছিলেন সম্মেলনে। দীর্ঘ বন্ধুর সে পথ-প্রান্তর দুই দিবসেই অতিক্রম করা হইল।

এই প্রকার দুঃসাহসিক বা অসম্ভব কর্ম্ম সম্পাদনের মধ্যেই তরুণদের আত্মবিশ্বাস, সহনশীলতা ও শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত হইবার সুযোগ হয়—শুধু মুখের উপদেশে যাহা সম্ভবপর হয় না—ইহাই ছিল সতীন্দ্রনাথের বিশ্বাস এবং তাঁহার কর্ম্মী গঠনের নীতি।

এতদিন পর্য্যন্ত পটুয়াখালী মহকুমার মধ্যেই তাঁহার কর্ম্মস্থান ছিল নির্দ্ধারিত। সমগ্র জিলার কংগ্রেসের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করিবেন এরূপ আগ্রহ বা ইচ্ছা তাঁহার আদৌ ছিল না। সুতরাং নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য প্রচ্ছন্ন যে আয়োজন বা প্রচেষ্টা থাকে স্বভাবতই সতীন্দ্রনাথের মধ্যে তাহার আভাস ছিল না। তাঁহার সমুদয় কল্পনা আগ্রহ বা প্রচেষ্টা নিযুক্ত করিতেন কর্ম্মের মধ্যে আর কর্ম্ম তিনি খুঁজিয়া বাহির করিতেন।

সুতরাং এই সম্মেলনে উপস্থিত সমগ্র বরিশালের প্রবীণ নেতৃবৃন্দ সতীন্দ্রনাথকে যখন বরিশালের কংগ্রেসের ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন তখন তিনি সম্মত হইলেন এই মনে করিয়াই যে তাঁহার কর্ম্মের পরিধি এবার হইবে বিস্তৃত। নিজের

চেষ্টায় দল পুষ্ট করিয়া কংগ্রেসের নেতৃত্ব গ্রহণ তাঁহাকে করিতে হইল না, সকলের শুভেচ্ছা লইয়াই সাধারণের আগ্রহে তিনি নূতন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন।

* * *

কংগ্রেসের নেতৃত্ব

কংগ্রেস-সম্পাদকরূপে সতীন্দ্রনাথ বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কোথায় থাকিবেন এবং খাইবেনই বা কোথায় ইহার কোন স্থির ব্যবস্থা ছিল না। পটুয়াখালী থাকা অবস্থায় এই সমস্যা কখনও ছিল না। ৫।৭ জন কর্ম্মীসহ যখন তখন উপস্থিত হইলেও পিতার আশ্রয় ছিল সদা উন্মুক্ত।

কিন্তু এখানে দেখা দিল সে সমস্যার চরম রূপ—পরম সুন্দর ভাবেই হইল বরিশালের সে সমস্যার সমাধান।

রাজা বাহাদুরের হাবেলীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে 'অশ্বিনীকুমার টাউন হল' তখন নির্ম্মিত হইতেছিল। উহার দুইটী অসম্পূর্ণ গৃহে তাঁহার থাকিবার এবং কংগ্রেস অফিস স্থাপন করিবার ব্যবস্থা হইল। প্রায় সাত আটজন কর্ম্মীসহ নিজের আহারের ব্যবস্থা হইল আরও চমৎকার রূপে। আবশ্যকীয় অর্থ যখন নাই, তখন বিভিন্ন দোকানীদের নিকট আবেদন করিয়া সংগৃহীত হইতে থাকিল দৈনিক প্রয়োজনীয় আহার্য্য দ্রব্যাদি। সংগৃহীত দ্রব্যাদি নিজেরাই রন্ধন করিয়া আহার্য্য প্রস্তুত করা হইল।

সতীন্দ্রনাথের ইচ্ছা থাকিলে যে কোন সঙ্গতিশালী ব্যক্তির গৃহে সাদরে হইতেন নিমন্ত্রিত, হইতে পারিত স্বচ্ছন্দে আহারের

ব্যবস্থা। কিন্তু সহকর্মীদের সহিত একযোগে নিজকে মিলিত রাখিবার প্রকৃতি ছিল তাঁহার সহজাত, এবং এই কারণেই তিনি যেমন জীবনব্যাপী পাইয়াছেন সহকর্ম্মীদের অকুণ্ঠ ভালবাসা, তেমনি ছিল তাঁহার উপর তাহাদের অসীম বিশ্বাস।

বরিশাল সহরে আসিয়া সর্ব্বপ্রথমেই তিনি দৃষ্টি দিলেন তরুণ ছাত্র-যুবকদের সংগঠনের দিকে। ব্যায়ামাগার ও পাঠগৃহ স্থাপন এবং রাজনৈতিক পুস্তকাদি পাঠ ও আলোচনা চলিত যেমন একদিকে, তেমনই বিপন্ন রুগীর সেবায়, আর্ত্তের সহায়তায় এবং শ্মশান-যাত্রীর বন্ধু রূপে কর্ত্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হইত এইসব যুবক-তরুণদের।

বিভিন্ন কর্ম্মের মধ্যে চরিত্র-গঠনে তিনি যেমন ছিলেন উন্মুখ—তেমনি নির্ম্মম হস্তে তিনি দমন করিতেন অসংযত চরিত্রের উচ্ছৃঙ্খলতা। ছাত্র বা যুবক সমাজের মধ্যে অন্যায়ের প্রশ্রয় তিনি আদৌ সহ্য করিতেন না। বল প্রয়োগেও তিনি অসংযমকে শৃঙ্খলতায় বাঁধিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

শ্রীশৈলেন দাশগুপ্ত (রুনুবাবু) ছিলেন ব্রজমোহন শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। অফুরন্ত তারুণ্যের মূর্ত্ত প্রকাশ ছিল তাঁহার বিভিন্ন কর্ম্মের মধ্যে। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৯২২ সনের শেষের দিকে গঠিত হয় 'তরুণ সঙ্ঘ'। ১৯২৪ সনে বিনা বিচারে বন্দী রূপে তিনি গ্রেপ্তার হইলেন। তরুণ সঙ্ঘও যেন সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছিল।

সেইদিন আবার সতীন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন সংস্থার মধ্যে।

তাঁহার প্রেরণায় ও উৎসাহে এক নূতন কর্ম্মোন্মাদনা ও উৎসাহের বন্যা 'তরুণ সঙ্গ'কে উত্তাল ও কর্ম্মমুখর করিয়া তুলিল। আর সেই কর্ম্মক্ষেত্রেই পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বিশিষ্ট ও অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী ৺তারাপদ ঘোষ ও শ্রীশৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের খিলাফৎ সমস্যা অসহযোগ আন্দোলনের সহিত যুক্ত থাকার দরুণ হিন্দু মুসলমানের যে অভূতপূর্ব্ব মিলনের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল—উহাও তখন স্তিমিত-প্রায় হইয়া গেল। বৃটিশ সরকারের কূটনৈতিক ফলে প্রতিষ্ঠিত হইল এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব, যাহাদের বিবিধ চক্রান্তের ফলে আদর্শগ্রাহী স্বাধীনতা-প্রয়াসী ও মহৎপ্রাণ জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দকে ক্রমশঃ নেতৃত্ব হইতে বিচ্যুত করা হইল। অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বিপুল সংখ্যক মুসলমান সম্প্রদায়কে পরিচালিত করা হইল প্রতিক্রিয়াশীল কর্ম্মপন্থায়। বৃটিশদের সহিত সংঘর্ষে রহিয়াছে স্বার্থত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণ করা, সুতরাং স্বার্থত্যাগ ও লাঞ্ছনা বরণ না করিয়াও যদি নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়, তবে সেই পথ ও মতের আকর্ষণ থাকাই তো স্বাভাবিক।

কাজেই মুসলমান সম্প্রদায়ের এই প্রকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব দেখিয়াও সতীন্দ্রনাথ বিচলিত হইলেন না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সমগ্র জনসাধারণের স্বাভাবিক উন্নতি ও বিকাশের জন্যই প্রয়োজন হিন্দু-মুসলমানদের মিলিত প্রচেষ্টা। সুতরাং বিপথগামী নেতৃত্বের অবসান একদিন হইবেই। এজন্য প্রয়োজন সাধারণের মধ্য হইতেই অসাধারণ নেতৃত্ব গড়িয়া

তোলা। হয়তো ইহা দীর্ঘ সময় সাপেক্ষ, তবু প্রচেষ্টা তাঁহার করিতেই হইবে।

।রত্ন৽

সতীন্দ্রনাথ চিরকাল ছিলেন আশাবাদী। সুতরাং যে সমস্ত মুসলমান সহকর্ম্মী কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের মনোভাব জানিবার এবং সম্ভবপর হইলে পুনরায় তাহাদিগকে কর্ম্মে উদ্বুদ্ধ করা চলে কিনা—একবার যাচাই করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন। এই উদ্দেশ্য লইয়া সমস্ত পটুয়াখালী মহকুমার দূর দূরান্তরে পরিভ্রমণের পরিকল্পনা করিলেন।

হেমন্তের শেষে মাঠের ধান কাটা যখন প্রায় শেষ, এমনি এক সময়ে কতিপয় সহকর্ম্মীসহ সতীন্দ্রনাথ চলিয়াছেন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করিয়া পদব্রজে। নৌকার পথ ছিল বিশেষভাবে দীর্ঘতর,—গমনে বিলম্ব হইতে পারে বিস্তর—কাজেই দ্রুত কর্ম্ম শেষ করিবার ইচ্ছায় পদব্রজেই চলিলেন।

বরিশাল জিলার দক্ষিণাঞ্চলে পথ-ঘাট এক প্রকার ছিল না বলিলেই চলে। যে গ্রামের উদ্দেশ্যে চলিয়াছেন উহার মোটামুটি দিক জ্ঞান ছাড়া আর কিছুই ছিল না জানা। পথহীন অজানা প্রান্তরে চলিতে চলিতে সন্ধ্যা হইল—রাত্রি আসিল। জনমানবহীন দিগন্ত পরিব্যাপ্ত মাঠের পর মাঠ—উহার মধ্যে আকাশের মিট-মিটে নক্ষত্রের আলোকই ছিল একমাত্র চলিবার পথ-প্রদর্শক। আবার চলিতে চলিতে অকস্মাৎ পথ হইল রুদ্ধ,

স্রোতস্বিনী নদীর আবির্ভাবে। চলা পথেরও কোন নির্দ্দেশ নাই—যেটুকু বা চিহ্ন বুঝিবার মতন আছে তাহাও রাত্রির অন্ধকারে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্ত্তী স্থানের এইসব ছোট বড় নদীতে কুমীরের থাকে বিশেষ আনাগোনা। এমন কি কূলবর্ত্তী স্থানসমূহও বিশেষ নিরাপদ ছিল না—অদূরবর্ত্তী সুন্দরবন অঞ্চলে বর্দ্ধিত সুপরিচিত হিংস্র পশু-জানোয়ারের মাঝে মাঝে আবির্ভাব হওয়াও ছিল না অস্বাভাবিক। কাজেই এতদঞ্চলের লোকজনও রাত্রে অন্ধকারে অগ্নি-মশাল না জ্বালাইয়া গৃহের বাহির হইত না।

সবদিক দিয়াই পথের অবস্থা অতীব চমৎকার!

এ হেন পরিস্থিতিতে সম্ভাব্য বিপদ সতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীদের নিকট ছিল যেন তুচ্ছ ব্যপার। 'সতীনদা' যখন আছেন উহার একটা ব্যবস্থা হইবেই—এইরূপ ছিল প্রত্যয়শীল নির্ভরতা!

কোন অবস্থাতেই বিচলিত হইবার স্বভাব ছিল না সতীন্দ্রনাথের। সুতরাং জনমানবহীন নিস্তব্ধ অন্ধকারের দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরে পথভ্রষ্ট এবং অসহায় পথিক রূপে ও পথ চলার অবসরে আকাশের সংখ্যাহীন উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ আকৃষ্ট করিত সতীন্দ্রনাথের কাব্যিক মন। আপন ক্ষুদ্রতা যেন বিলীন হইতে চাহে অসীমের মধ্যে। যে বৃহৎ এর আকর্ষণে জীবনের প্রারম্ভেই আপন ক্ষুদ্রতম গণ্ডী তিনি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন, যেন সেই অসীম অনন্তের সুর বাজিয়া উঠিল তাহার সীমিত অন্তরে। মনের ভরপুর আনন্দে গাহিয়া উঠিলেন রবীন্দ্রনাথের সেই গান—

তা বলে ভাবনা করা চলবে না

তুই বারে বারে ঠেলবি দুয়ার

হয়তো দুয়ার খুলবে না,

তা বলে ভাবনা করা চলবে না।···

উদ্বেলিত উল্লাসে সহ-কর্ম্মীরা সমস্বরে গাহিয়া উঠিলেন সেই গান। তাল, লয়, মানের হিসাব ছিল না এ গানে—আনন্দের স্বতস্ফুর্ত্ত অভিব্যক্তি ছিল সেই সমবেত সুর-লহরীতে। প্রকৃতির এক নূতন সৌন্দর্য্য যেন প্রকাশমান হইল। পরিপূর্ণ মনের আবেগে আবার সকলে গাহিয়া উঠিল—

"ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,

তাহার মাঝে আছে যে দেশ সকল দেশের সেরা,

সে যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

এমন দেশটি কোথায়ও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,

সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।"

প্রকৃতির অপূর্ব্ব পরিবেশে সকলের উল্লসিত মন ছিল অন্তর্মুখী। সুতরাং প্রাণের পরিপূর্ণ আবেগ ছিল সকলের কণ্ঠে, দিক হইতে দিগন্তের নিস্তব্ধ প্রান্তরে সেই সুর-লহরী ছড়াইয়া পড়িল নূতন মূর্চ্ছনায়।

এদিকে চলার পথে সময় বেশ অতিক্রম হইয়া চলিয়াছে। এ বিষয়ে কাহারও ছিল না কোন লক্ষ্য। অকস্মাৎ নদীর তীরে দেখা গেল ক্ষীণ আলোর আনা-গোনা। চমৎকৃত হইল সকলে নূতন বিস্ময়ে। বিস্ময়ের উপর বিস্ময়—অন্ধকার রজনীতে

নদীর জলে চলিয়াছে একখানা তরণী—মনে হইল যেন আসিতেছে এপারেরই দিকে। দেখিতে দেখিতে সত্যই উপনীত হইল সেই তরণী পথহারাদের পথের সন্ধান দিতে—আহ্বান আসিল, তরঙ্গময় নদীবক্ষের বায়ুতরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হইয়া—"আসেন আপনারা, নদী পার কইরা দেই!"

সেদিনকার পার-ঘাটে কাণ্ডারী হইল নিতান্ত এক অপরিচিত পান্থের দল।

* * * *

মহাত্মা গান্ধীর আগমন

ক্রম-বর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িক অসন্তোষের পরিবেশে ১৯২৫ সনের জুন মাসে বরিশাল পরিভ্রমণে আসিলেন মহাত্মা গান্ধী।

অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক ছিলেন সতীন্দ্রনাথ। এই কারণে স্বভাবতই গান্ধীজীর সহিত তাঁহার যোগাযোগ বিশেষ ভাবে সৃষ্টি হইল।

গান্ধীজীর সান্নিধ্য লাভ করিয়া সতীন্দ্রনাথ যেন এই বিপর্য্যয়ের মধ্যেও এক নূতন পথের সন্ধান পাইতে চান।

গভীর আবেগের সহিত গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমান মিলন এবং চরখা গ্রহণের জন্য আবেদন করিলেন। শুনাইলেন অহিংসার সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্ব।

ভারতের স্বাধীনতার পথে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার যে ক্রম-বিস্তৃতি, উহার প্রতিরোধ কোন পথে—বিক্ষুব্ধ চঞ্চল চিত্তে গান্ধীজীর সমীপে সতীন্দ্রনাথ এই প্রশ্নই উত্থাপিত করিলেন।

ভীরুতা বা কাপুরুষতা ছিল না গান্ধীজীর অহিংসার প্রয়োগে। সত্য, বীর্য্য ও ত্যাগের মধ্যেই রহিয়াছে অহিংসার অভয় বাণী। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান বিরোধের মূল সমস্যাকে তিনি দেখিলেন তাঁহার অহিংসার দৃষ্টিতে। অকপটে বলিলেন— "Hindus are cowards and Muslims are bullies. There can be no friendship between the two, unless both are strong."—"হিন্দুরা ভীরু এবং মুসলমানরা দুর্দ্দান্ত। বন্ধুত্ব সম্ভব তখনই, যখন উভয়েই হইবে সম-শক্তিমান।

গান্ধীজী বিশ্বাস করিতেন যে, অহিংসার মধ্যেই রহিয়াছে সংখ্যালঘুদের শক্তির উৎস।

স্কুল-কলেজ প্রাঙ্গণে হিন্দু ছেলেদের চিরাচরিত সরস্বতী পূজার বিরোধিতার প্রশ্নে গান্ধীজী উদ্দীপ্ত কণ্ঠে দৃঢ় উত্তর দিলেন— "Hindusthan is the common compound of both Hindus and Muslims, for this, would not any religious rites of the Hindus be performed?"— "হিন্দুস্থান হইল হিন্দু মুসলমান উভয়ের সমবেত প্রাঙ্গণ—এজন্য কি হিন্দুদের কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইবে না?

কি তাহাদের কর্ত্তব্য, সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যায় কংগ্রেস কর্মীদের কার্য্য কোন নীতি দ্বারা হইবে পরিচালিত—ইহাই ছিল সে সময়ের চরম প্রশ্ন। দ্বিধাহীন চিত্তে গান্ধীজী বলিলেন—"কংগ্রেস কর্মীগণ হইবেন সত্যাগ্রহী; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার বা জুলুমবাজীর বিরুদ্ধে

সর্ব্বত্র করিবে সংগ্রাম। যেখানে রহিয়াছে ন্যায় বিচারের প্রবল দায়িত্ব—সত্য অস্বীকারের ভীরুতা যেন সেখানে কংগ্রেস কর্মীকে স্পর্শ না করে।"

গান্ধী-নীতির মধ্যে সতীন্দ্রনাথের হইল নূতন দিক-দর্শন।

অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচাঞ্চল্যে তিন দিন অতিবাহিত করিয়া সদলবলে গান্ধীজী বরিশাল ত্যাগ করিলেন। ষ্টিমার খুলনার অভিমুখে যাত্রা করিল। পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত স্বেচ্ছাসেবকগণ রাজাবাহাদুরের হাবেলীর প্রাঙ্গণে হইলেন সমবেত। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত, রাত্রের প্রথম প্রহরে চলিতেছে উৎসব, সকলেই আনন্দ মুখর যেন নূতন পথের সন্ধান মিলিয়াছে। পরমানন্দে মগ্ন—সহসা পিয়ন আসিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল এক তার-বার্ত্তা।

বিনামেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় আঘাতের বেদনায় চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন সতীন্দ্রনাথ। বাঙ্গালীর সে বিপদ-সংবাদ অতি বিষাদময়—শুধু বাঙালীর কেন, বুঝি ভারতের—বুঝি সারা জগতের সে এক মর্ম্মন্তুদ বার্ত্তা—"দেশের দেশবন্ধু আর নাই।"

দার্জ্জিলিং এর ষ্টেপ এসাইডে সেই দিবস অপরাহ্ণে তাঁহার দেহ-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে—দেশবন্ধু চির বিদায় নিয়াছেন।

সে কী ক্রন্দন সতীন্দ্রনাথের! জীবনে যাঁহার চক্ষুর জল কেহ দেখে নাই, দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদের পর হইতে সেই সতীন্দ্রনাথের নয়নের জলধারা কেবল অশ্রান্ত বহিয়াই চলিল। ছুটিয়া চলিলেন তিনি একান্তে—নির্জ্জনে। সমস্ত রজনী অতিবাহিত করিলেন শ্লথ পদচারণে। নয়নের জল অঝোরে ঝরিয়া যায়, শুষ্ক হয় না।

রজনী অবসানের সাথে সাথে কিন্তু স্তব্ধ ও আত্মস্থ হইলেন, তবে রহিলেন নিঃসঙ্গে—একান্তে। ক্রমান্বয় সাত দিন পর্য্যন্ত রহিলেন মৌন, রহিলেন পূর্ণ অনশনে।

দেশবন্ধুর মৃত্যু সংবাদ সমগ্র দেশবাসীর অন্তরকে দুঃখ-বেদনায় আপ্লুত করিয়াছিল, সকলের চিত্তই আজ শোককাতর কিন্তু সতীন্দ্রনাথের অন্তর এমনভাবে ক্লিষ্ট পীড়িত, বেদনা-জর্জ্জর হইয়া উঠিল কেন? দেশবন্ধুর সহিত এমন কোন বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বা গভীর অন্তরঙ্গতা ছিল না তাঁহার। রাজনৈতিক বিশিষ্ট কর্ম্মীদের একজন হিসাবে দেশবন্ধুর সহিত ছিল তাঁহার সামান্য পরিচয় মাত্র। কিন্তু কী গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতির আবেগ ছিল তাঁহার দেশবন্ধুর প্রতি! হয়তো দেশবন্ধুর বিরাট হৃদয়, মন ও অন্তরের সহিত আপন বিশাল অন্তরের যোগসূত্র রচিত হইয়াছিল অজ্ঞাতে। হয় তো তাই বৃহৎ এক হৃদয় বৃহত্তরের জন্য হইয়াছিল আকুল!

* * * *

লাউকাঠি কর বন্ধ আন্দোলন

নূতন বিধান মতে বঙ্গীয় সরকার সমগ্র পল্লী অঞ্চলে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনে হইলেন বিশেষভাবে উদ্যোগী। এই প্রকারের ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপনের বিরুদ্ধে সুবিখ্যাত নেতা বীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুর জিলায় কর-বন্ধ আন্দোলন সফলতা লাভ করে। এইরূপ সংঘাত সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক এখানে সেখানে এমনিভাবে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইতেছিল।

সরকারী নোটিশে ঘোষিত হইল পটুয়াখালী মহকুমার লাউকাঠি ইউনিয়নেও বোর্ড স্থাপিত হইবে। দেখিতে দেখিতে কর্ত্তৃপক্ষের আদেশে গঠিত হইল সাময়িক বোর্ড, এবং নিয়মিত নির্দ্দিষ্ট চৌকিদারী খাজনার পরিবর্ত্তে নির্দ্ধারিত হইল বর্দ্ধিতহারে বোর্ডের টেক্স।

এই বোর্ড স্থাপনের ব্যাপারে স্থানীয় জনসাধারণের ছিল ঘোরতর আপত্ত্য। তাহাদের মতের বা যুক্তির উপর কর্ত্তৃ-পক্ষের আদৌ কোন আস্থা বা শ্রদ্ধা ছিল না, সুতরাং তাহারা আসিল সতীন্দ্রনাথের নিকট ইহার প্রতিকার ব্যবস্থায়।

সতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশে বিধিমত রচিত এক আবেদন পত্র ইউনিয়নবাসীর সমুদয় লোকের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত হইল। নির্দ্দিষ্ট প্রতিনিধিগণ জেলা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সাক্ষাৎভাবে আবেদন করিলেন—প্রস্তাবিত বোর্ড স্থাপন না করিবার জন্য। কিন্তু কিছুই হইল না। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বলবৎ হইয়াই রহিল—সকলকে তাহা পালন করিতেই হইবে।

বাধা দিবার সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা হইল ব্যর্থ। স্থির হইল জনসাধারণের প্রতি এই ঘোরতর অবিচারের একমাত্র সমুচিত উত্তর—"টেক্স না দেওয়া।"

সতীন্দ্রনাথ জানিতে চাহিলেন সমগ্র ইউনিয়নবাসীর অভিমত। টেক্স বন্ধ করিবার মধ্যে রহিয়াছে বিপদ ও লাঞ্ছনা। ইহা সত্ত্বেও কি তাহারা সমবেতভাবে প্রস্তুত থাকিবে? অবশ্য সতীন্দ্রনাথের উপস্থিতি ছিল সাহস ও উদ্দীপনার জ্বলন্ত প্রতীক।

সুতরাং সতীন্দ্রনাথ যখন আছেন তাহাদের মধ্যে, তখন আর তাহাদের ভয় কোথায়! মহা উৎসাহের সহিত স্থানীয় জনসাধারণ স্থির করিলেন টেক্স দেওয়া হইবে না।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে পটুয়াখালী মহকুমার শতকরা ৯৫ জন হইল মুসলমান। সুতরাং এই লাউকাঠি ইউনিয়নের আন্দোলনকারী জনসাধারণ প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের। মুষ্টিমেয় হিন্দু যাহারা ছিলেন তাহার মধ্যে আবার কয়েকজন ছিলেন সরকার পক্ষের অনুগ্রহভাজন।

এই কর-বন্ধ আন্দোলনের পূর্ণ নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন সতীন্দ্রনাথ একমাত্র এই সর্ত্তে যে আন্দোলনের গতি ও প্রকৃতি থাকিবে সম্পূর্ণভাবে 'অহিংস'।

সরকারী মহলে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। বিরাট সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আনয়ন করা হইল এবং অদূরে স্থাপিত হইল পুলিশ বাহিনীর তাঁবু। মনে হইল এক বিপুল সংঘর্ষ আগতপ্রায়—এক বিরাট সমর-সজ্জা যেন প্রস্তুত!

ট্যাক্স আদায়ের নোটিশের পর নোটিশ আসিল। আসিল মাল ক্রোকের নোটিশ এবং অবশেষে মাল ক্রোক করা হইল সুরু। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে সশস্ত্র পুলিশসহ অফিসারগণ গৃহে গৃহে যাইয়া ক্রোকের বলে অস্থায়ী মাল আটক করিলেন। গৃহের পর গৃহে এরূপ ক্রোক চলিতে লাগিল কিন্তু আসিল না কোন বাধা। আনন্দে উৎফুল্ল সরকারী কর্ম্মচারীগণ মাল-পত্র ক্রমশঃ আটক করিয়াই চলিলেন।

অবশেষে দেখা দিল এক অদ্ভুত সমস্যা। এরূপভাবে আটক করা বহু মাল-পত্র এখন বহন করিবে কে? কুলী পাওয়া গেল না বা কোন লোকজনও পাওয়া গেল না। কে উহা বহন করিবে? বাহির হইতে লোক আনিবার চেষ্টা হইল ব্যর্থ। পরে চেষ্টা করা হইল—উপস্থিতভাবে নিলাম বিক্রয় করা চলে কিনা। কিন্তু নিলাম বিক্রয়ের ক্রেতা কোথায়? কেহই আগাইয়া আসিল না ক্রয়ের জন্য।

পুলিশ অফিসারগণের উৎফুল্ল আনন্দ ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত উন্মত্ততায় পর্য্যবসিত হইয়া উঠিল। এবার জোর জুলুম সুরু হইল স্থানীয় জনসাধারণের উপর—মাল বহন করিয়া দিতেই হইবে—নচেৎ বিষম ঘটনার হইবে অবতারণা—বুঝিবা সে এক অত্যাচারের পূর্ণ বিভীষিকা!

নির্ব্বাক দর্শকের ন্যায় এতক্ষণ সব দেখিতেছিলেন অহিংস-ব্রতী সতীন্দ্রনাথ। কিন্তু যখন বে-আইনী জুলুম হইল সুরু, তিনি দিলেন দৃঢ়ভাবে বাধা।

ক্রুদ্ধ পুলিশ অফিসার চিৎকার করিয়া উঠিল—"সরকারী কার্য্যে বাধা দেওয়া চলবে না।"

সংযত কণ্ঠে উত্তর করিলেন সতীন্দ্রনাথ—"বে-আইনী কার্য্যে বাধা দিবার অধিকার সকলের আছে।"

তুমুল তর্ক বিতর্কের মধ্যে এক উত্তেজনার মুহূর্ত্তে আত্মসম্বিৎ-লুপ্ত পুলিশ অফিসারের মুষ্টিবদ্ধ হস্ত নিক্ষিপ্ত হইল সতীন্দ্র-নাথের প্রতি। আত্ম-রক্ষার স্বাভাবিক প্রকৃতির বলে উহা

হইল প্রতিহত। ফলে স্থূলকায় পুলিশ ফিসারাট শারীরিক স্থিতি রক্ষা করিতে না পারিয়া স্থানচ্যুত হইয়া পড়িলেন পার্শ্ববর্তী পয়নালীর মধ্যে। এবম্বিধ-পরিস্থিতি পার্শ্বস্থ প্রহরীদের মস্তিষ্কে ঘটাইল বিকৃতি। অকস্মাৎ জনৈক সশস্ত্র পুলিশ তাহার উন্মুক্ত সঙ্গীন সহ মহাবীর বিক্রমে আক্রমণ করিল সতীন্দ্রনাথকে। সম্মুখ হইতে আসিল না আঘাত, আঘাত আসিল পিছন দিক হইতে, অপ্রস্তুত সতীন্দ্রনাথের মস্তকের পশ্চাৎদিক হইল বিদীর্ণ। আঘাতপ্রাপ্ত স্থান হইতে প্রবাহিত রক্তধারা সমস্ত দেহকে করিল রঞ্জিত। ঘটনার আকস্মিকতায় এই তীব্র পরিস্থিতি বিহ্বল করিয়া দিল সমবেত জনসাধারণকে।

দেখিতে দেখিতে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই কাতারে কাতারে অগণিত জনতা সতীন্দ্রনাথকে আবৃত করিয়া ফেলে। চতুর্দ্দিকের এই জনসমুদ্র এক মহামারী প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তিতে প্রকাশমান। দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত জনতা চিৎকার করিয়া উঠিল—'সর্দ্দারের হুকুম চাই। যে মাটি সর্দ্দারের রক্তে হয়েছে লাল, অসভ্য ঐ পুলিশের রক্ত দিয়ে সে জায়গা আমরা ধুইয়ে দেব।' জনতা তাঁহাদের "সর্দ্দারের" জন্য সেদিন ক্ষিপ্ত।

প্রমাদ গণিলেন সতীন্দ্রনাথ। চতুর্দ্দিকের দণ্ডায়মান দশ বার হাজার সশস্ত্র বিচলিত জনতার উদ্দীপ্ত ভঙ্গী এক অভাবনীয় পরিবেশ সৃষ্টি করিল। ক্ষতস্থানের প্রবাহিত রক্তধারা উপেক্ষা করিয়াও কঠোর ও দৃঢ়তার সহিত সতীন্দ্রনাথ উচ্চস্বরে প্রশ্ন

করিলেন—'আমি জানতে চাই, সর্দ্দারের হুকুম তামিল করবার হিম্মত কার আছে ?'

সহস্র কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—'আমাদের সকলের।'

—"বেশ, তাই যদি হয় আমি হুকুম দিচ্ছি—এখনি এই মুহূর্ত্তেই সকল অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে দাও—একটী ক্ষুদ্র পাচন-কাঠিও যেন না দেখতে পাই। হিংসার পথে নয়—অহিংসার পথেই আমাদের জয়।" যে সশস্ত্র জনতা অনতিকালের মধ্যেই সরকারী শক্তিকে করিতে পারিত পর্যুদস্ত তাহারা কিনা মন্ত্রমুগ্ধবৎ সমুদয় অস্ত্র-শস্ত্র মুহূর্ত্তের মধ্যেই করিল পরিত্যাগ। সতীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা, প্রীতি ও আস্থার এক অপূর্ব চিত্র হইল উদ্ঘাটিত।

ঘটনার দ্রুত নাটকীয় পরিণতিতে টেক্স আদায়কারী কর্ম্মচারী-গণ হইল স্তম্ভিত ও বিহ্বল। জরুরী বার্ত্তা পাইয়া পরদিবস আসিলেন জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ ই, এন, ব্লাণ্ডী। আমন্ত্রণ করা হইল ইউনিয়নের জনসাধারণকে এক জনসভায় এবং মিঃ ব্লাণ্ডী বোর্ড স্থাপনের উপকারিতা বুঝাইবার বিশেষ চেষ্টা করিলেন। স্থির সঙ্কল্প, দৃঢ় চেতা সমগ্র জনসাধারণ একবাক্যে অস্বীকার করিল এই ইউনিয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা। এরূপ একতার, শৃঙ্খলাযুক্ত দৃঢ় মনেভাবের সম্ভাবনা থাকিতে পারে—ইহা ছিল মিঃ ব্লাণ্ডীর নিকট বিশেষ ভাবে অভাবনীয়। হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রতিরোধ ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য বলিয়াই যেন মনে হইত না। কিন্তু তিনি সত্যকে এখন সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিলেন। অবশেষে বাধ্য হইয়াই তিনি ঘোষণা করিলেন যে বোর্ড স্থাপনের আদেশ প্রত্যাহৃত হইল।

আনন্দের উল্লাসে সমবেত জনতা চিৎকার করিয়া বলিল—'ব্লাণ্ডী সাহেব কী জয়'; কিন্তু মিঃ ব্লাণ্ডী অবিলম্বে বলিয়া উঠিলেন—'না, না বল 'সতীন সেন কী জয়'।

মিলনান্ত নাটকের পরিণতি মধুর পরিবেশে পরিসমাপ্ত হইল।

দেশের একটী নির্দ্দিষ্ট অংশের সমুদয় জনগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া আইন-অমান্যে জয়লাভ করা হইল সতীন্দ্রনাথের জীবনে এই প্রথম। জনতার চরিত্র জানিবার এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা তিনি অর্জ্জন করেন এই কার্য্যের মধ্যে। ফলে সমগ্র বরিশাল জিলার জনসাধারণ তাঁহার নামের ও তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে মুগ্ধ হইল। হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে দ্বিধাহীন চিত্তে তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিল।

ঘটনাটির পরিণতিতে এই ব্যবস্থাকেই আদর্শ করিয়া—বিভিন্ন ইউনিয়নের অধিবাসীগণ তাহাদের উপর আরোপিত বোর্ডের বিরুদ্ধে সতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে। এই ভাবেই মুরাদিয়া, আউলিয়াপুর প্রভৃতি পাঁচ ছয়টি স্থান হইতে সর্ব্বশক্তিমান সরকার বাহাদুর ইউনিয়ন বোর্ড তুলিয়া লইলেন!

* * * *

সাম্প্রদায়িকতার বিকৃতি

নিজে হিন্দু বলিয়া সতীন্দ্রনাথের কোন গোঁড়ামী কখনও ছিল না। হিন্দু-মুসলমান, উচ্চ-নীচ সকল শ্রেণীর সহিত ছিল তাঁহার সম ব্যবহার। ছুঁৎমার্গ তিনি কোনদিনই স্বীকার করেন

নাই। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বেকার পূর্ব্ববঙ্গের সহর-পল্লীর কঠোর সামাজিকতার মধ্যেও তিনি ছুঁৎমার্গ অস্বীকার করিয়া চলিতেন। হিন্দু-মুসলমানে পার্থক্যবোধ তিনি কোন দিনই করেন নাই।

সতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারী মহল যেমন বিভ্রান্ত বোধ করিল, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতৃবৃন্দেরও হইল তেমনি আতঙ্ক। সাধারণ মুসলমান সমাজকে যে প্রকারেই হউক তাঁহার আকর্ষণীয় ক্ষমতা হইতে দূরে রাখিতে হইবে সমাদরের ছলনায়। বৃটিশ সরকারের এই ছল প্রচ্ছন্ন পৃষ্ঠপোষকতায় উগ্র সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকিল।

নানাবিধ অশান্তির সংবাদ পল্লীর বিভিন্ন স্থান হইতে আসিতে শুরু করিল। এমন কি কলেজের হিন্দু ছাত্রদের চিরাচরিত প্রথামত এবার কলেজ প্রাঙ্গণে সরস্বতী পূজা করিতে বাধা দেওয়া হইল। আপোষের মনোভাব লইয়া কলেজের হিন্দু ছেলেরা পূজা স্থান, কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে সরাইয়া হিন্দু হোষ্টেলের অভ্যন্তরে পরিবর্ত্তন করিতে চাহিল। কিন্তু তাহাতেও হইল আপত্তি।

বিক্ষুব্ধ ও অপমানিত ছাত্রেরদল আসিল সতীন্দ্রনাথের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিতে। তিনিও হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহিত বহু আলাপ আলোচনা করিলেন কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হইল না। মুসলমান নেতৃবৃন্দের দাবী—কলেজ প্রাঙ্গণে কোন প্রকারেরই পূজা হইতে পারিবে না। যদি উহা মান্য না করা

হয় তবে উহার প্রতিক্রিয়ার জন্য তাহারা দায়ী হইবেন না। এমন কথাও উঠিল যে হিন্দু ছাত্ররা যদি পূজা করিতে পারে তবে মুসলমান ছেলেরাই বা কেন গরু কোরবাণী করিতে পারিবে না? যুক্তি অকাট্য!

এই প্রচ্ছন্ন ভীতি প্রদর্শন কার্য্যকরী হইল। সরকারী কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করিলেন ১৪৪ ধারা, যেহেতু শান্তিভঙ্গে আশঙ্কা রহিয়াছে। শান্তিভঙ্গের কারণ কোথায় এবং কাহাদের দ্বারা সম্ভব সে বিচারের অবশ্য প্রয়োজন ছিল না। তবে হিন্দু ছাত্রগণ যদি সরস্বতী পূজা হইতে বিরত থাকেন তবে শান্তিভঙ্গের আশু কোন কারণ থাকিবে না—ইহা কর্তৃপক্ষ উত্তমরূপেই জানিতেন।

অন্যায় করা ও অন্যায় সহ্য করা ছিল কর্ম্মী সতীন্দ্রনাথের নিকট সম-অপরাধ। সর্ব্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে সাহসী মন লইয়া দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইবার শিক্ষা দেশবাসী গ্রহণ করুক—ইহাই ছিল তাঁহার কামনা। সুতরাং ছাত্রদের তিনি উদ্বুদ্ধ করিলেন এই অন্যায় অপমানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার জন্য। প্রস্তুত হইল সরকারী আইন অমান্যের ব্যবস্থা—চিরাচরিত প্রথামত এবারও করা হইবে সরস্বতী পূজা। বাধা বিঘ্ন যতই আসুক না কেন পূজা হইবেই।

কলেজ হোষ্টেলের প্রবেশ দ্বারে ব্যাপক পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হইল। হিন্দু জনসাধারণ বিশেষ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সহিত পরবর্ত্তী দুর্ঘটনার অপেক্ষা করিতে থাকিলেন। সংবাদ রটিল যে মুসলমান হোষ্টেলের অভ্যন্তরে বৃহৎ এক

মুসলমান জনতার সমাবেশ হইয়াছে গরু কোরবাণী করিবার মানসে। চাপা উত্তেজনার বিশেষ প্রকাশ ছিল চতুর্দ্দিকে।

সেদিন বোধ করি বরিশাল সহরের বা নিকটস্থ সহরতলীর এমন কোন তরুণ-যুবক ছিল না যাহারা সতীন্দ্রনাথের এই নূতন অভিযানে উপস্থিত হয় নাই। সহস্র সহস্র তরুণ যুবকদের সম্মিলিত চাঞ্চল্য-মুখর জনতা সুশৃঙ্খলভাবে চলিল কলেজ প্রাঙ্গণের দিকে—অন্যায়ের প্রতিকারার্থে। পরম সাহস ও চরম উৎসাহে পূর্ণ সেই অগ্রগতি প্রথম বাধা পাইল পুলিশ বেষ্টনী দ্বারা। আইনমত "ছাত্র জনতাকে" বে-আইনীরূপে ঘোষণা করা হইল, উহা অস্বীকার করা হইলে সকলকেই করা হইবে গ্রেপ্তার। ভ্রূক্ষেপহীন জনতা সরকারী হুকুম অমান্য করিয়াই অগ্রসর হইয়া চলিল আপন গন্তব্য পথে।

কলেজ হোষ্টেলের নির্দ্দিষ্টস্থানে পূজা হইল সমাপন। ছাত্র-জনতা স্বীকার করিয়া লইল যে তাহারা এখন বন্দী। সুতরাং কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশে সকলে চলিল থানার অভিমুখে আত্ম-সমর্পণ করিবার উদ্দেশ্যে। স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার আনন্দে উৎফুল্ল তরুণদল আগাইয়া চলিল, কিন্তু থানা প্রাঙ্গণের সংকীর্ণস্থানে এই বিপুল সংখ্যক বন্দীদের আশ্রয় হইবে কোথায়! এত অফিসারই বা কোথায় যে সকলের নাম ঠিকানা বিধিমত লিখিয়া রাখে। ফলে সর্ব্ববিধ আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িল। থানার অভ্যন্তরে সংঘটিত হইল এক নূতন অপূর্ব্ব দৃশ্য।

নৈতিক এবং বাস্তব অবস্থার চাপে পড়িয়া শেষ পর্য্যন্ত

কর্তৃপক্ষ এই গ্রেপ্তারের প্রহসন করিলেন পরিসমাপ্তি। ঘোষণা করা হইল যে সকলেই মুক্ত—কাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল না।

তরুণ সম্প্রদায়ের এই আত্মিক জয়ের আনন্দ সতীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করিল না। এই ঘটনার মাধ্যমে তিনি দেখিলেন মেঘাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের ইঙ্গিত। প্রতিক্রিয়াশীল এই সাম্প্রদায়িক বিপর্য্যয়কে কি করিয়া শান্ত করা যাইবে সতীন্দ্রনাথ বুঝিতে পারিলেন না। যেখানে যুক্তি নাই, সমবেদনা নাই, মহৎ আদর্শের প্রেরণা নাই—সেই বিপথমুখী নেতৃত্বের সহিত আদর্শ-বাদীর মিলন সম্ভব কোথায়? তিনি বুঝিলেন এই নেতৃত্বের নিকট যতই নতি স্বীকার করা হউক না কেন, তাহাদের দাবীর মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সংখ্যালঘু একটা সমগ্র সমাজকে অসহায়, পঙ্গু, দুর্ব্বল, ক্লীব ও কাপুরুষ সৃষ্টি করিয়াও যদি সেই নেতৃত্বকে পরিতুষ্ট করিয়া, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অগ্রণী করাইবার কোন প্রকার ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকিত, তবু না হয় তাহা বিবেচনার বিষয় হইত। কিন্তু যে নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বৃটিশ কূটনীতির ফলে—উহাকে বৃটিশ-বিরোধী আশা করা বাতুলতা ছাড়া আর কি বলা চলে!

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ

পটুয়াখালী মিউনিসিপাল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয় জনসাধারণের নিজস্ব প্রচেষ্টায়। বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রদত্ত অর্থ সাহায্যেই উহা হইয়াছিল সম্ভব। চতুর্দ্দিকের সাম্প্রদায়িক কলুষতার আবহাওয়া এখানেও আসিয়া দেখা দিল। মুসলমান সম্প্রদায়ের আপত্তির ফলে এবারকার সরস্বতী পূজা অন্যান্যবারের ন্যায় স্কুল গৃহে না করিয়া স্কুল প্রাঙ্গণেই উহা সমাপন করা হইল। পূজা অন্তে পরদিবস প্রাতে দেখা গেল পূজা বেদীর সম্মুখে পতিত রহিয়াছে কর্ত্তিত গরুর মুণ্ড। কয়েক দিন পরে রাত্রে বিদ্যালয়ের বৃহৎ গৃহটীও ভস্মিভূত হইয়া গেল।

প্রমাদ গণিলেন স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়। সমগ্র পটুয়াখালী মহকুমায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। সুতরাং আতঙ্কের কারণ উপস্থিত হইল।

শুধু তাই নয়, প্রতি বৎসরের ন্যায় বিনা বাধায় সরস্বতীর শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া হইল না। সরকারী নির্দ্দেশ—শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা রহিয়াছে, সুতরাং মসজিদের সম্মুখে শোভাযাত্রার সর্ব্বপ্রকার বাজনা বন্ধ রাখিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইলে তবে শোভাযাত্রার অনুমতি দেওয়া চলিবে।

অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া সতীন্দ্রনাথ চাহিলেন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মানজনক আপোষ মীমাংসা। মীমাংসার সূত্র হিসাবে আবেদন করিলেন যে মসজিদের প্রার্থনার সময় ব্যতীত

অন্য সময়ে সরকারী রাস্তার পর হিন্দুদের বাজনা সহকারে শোভাযাত্রা যাওয়ায় যেন কোন বাধা দেওয়া না হয়।

মাসের পর মাস জেলার সর্ব্বত্র এই আপোষের কথা লইয়া সকল নেতৃবৃন্দের নিকট আবেদন করিলেন। কিন্তু সকল আবেদন নিবেদন হইল ব্যর্থ—তাহাদের অভিযোগ—হিন্দুদের শোভাযাত্রার বাজনা সর্ব্ব সময়ের জন্য বন্ধ রাখিতে হইবে।

পটুয়াখালীর এই বিশিষ্ট মসজিদটী সুপ্রশস্ত সরকারী রাস্তার ঠিক উপরেই স্থাপিত ছিল না। এই রাস্তা হইতে নির্গত অপর একটী সঙ্কীর্ণ রাস্তার প্রান্তে উহা ছিল স্থাপিত। সুতরাং বাদ্য-বাজনা ঠিক তাহার সম্মুখস্থ সংলগ্ন রাস্তার উপর দিয়া যাইবার ব্যবস্থায় মসজিদের অভ্যন্তরে প্রার্থনায় রত ব্যক্তিদের কোন বিঘ্নই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই।

যদি প্রার্থনার বিঘ্নের কথা ধরিতে হয় তবে উক্ত মসজিদের সম্মুখস্থ সুপ্রশস্ত স্থানটী ছিল দেওয়ানী আদালতের প্রাঙ্গণ-ভূমি। সুতরাং প্রত্যহ সমস্তক্ষণ উক্ত স্থানে সমবেত বহু শত ব্যক্তির আসা-যাওয়ার দরুণ এবং বিবিধ কারণ বশতঃ যে হট্টগোল ও হল্লা সেখানে প্রতিনিয়ত চলিতে থাকে, মসজিদের অভ্যন্তরে প্রার্থনারত ব্যক্তিদের বিঘ্ন তাহা দ্বারাই সম্ভব। কালে ভদ্রে দু'এক মিনিটের জন্য চলমান শোভাযাত্রার বাদ্যাদির ধ্বনি অদূরস্থিত মসজিদে কি প্রকারে বিঘ্ন উৎপাদিত করিতে পারে, স্বভাবত উহা ধারণা করাই চলে না।

ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে মুসলমান সম্প্রদায়ের নামাজ পড়িবার সাধারণ নিয়ম হইল দিন-রাত্রের নির্দ্দিষ্ট পাঁচটি সময়। সুতরাং উক্ত নামাজের সময় ব্যতীত অপর সময়ে যদি পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার উপর দিয়া বাজনা বাজাইয়া কেহ চলিয়া যায়, তবে কি প্রকারে তাহাদের সমাজের ব্যাঘাত সৃষ্টি করিবে ইহা হৃদয়ঙ্গম করা চলে না।

মসজিদের সম্মুখে বাজনা বন্ধ রাখিবার দাবীই সমস্যার আসল রূপ ছিল না, শক্তিমান সম্প্রদায় দুর্ব্বল সম্প্রদায়কে কি প্রকারে দাবাইয়া রাখিতে পারে—উহারই অভিসন্ধি ছিল এই দাবীর পশ্চাতে। এই কারণেই যদি বাজনা বন্ধ রাখাও চলিত তথাপি একই যুক্তির বলে ক্রমে এই দাবী উঠিতে পারিত যে মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টা বা কীর্ত্তনের সঙ্গীত অপর সম্প্রদায়ের শ্রুতিগোচর হওয়া বিশেষভাবে অধর্ম্মজনক। এমন কি সেই যুক্তিতে হিন্দু মন্দিরের দেব-দেবীর মূর্ত্তি দর্শনও অধর্ম্মোচিত বলিয়া ঘোষিত হইতে পারিত।

দুর্ব্বল ও ভীত সম্প্রদায় যতই নতি স্বীকার করিতে থাকিবে শক্তিমান সম্প্রদায় ততই উগ্র হইয়া উঠিবে এবং এই দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষতায় অপর সম্প্রদায়কে হীনতার কার্য্যে প্ররোচিত করিবে। এ পরিবেশের ইহাই স্বাভাবিক গতি।

একই দেশে যখন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে বাস করিতে হইবে তখন উভয় সম্প্রদায়কেই সামঞ্জস্য রূপে সমাজ-গত জীবন নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক। উভয় সম্প্রদায়কেই হইতে হইবে

নৈতিক ব্যবহারে উন্নত। সুতরাং সতীন্দ্রনাথ দেখিলেন এক সম্প্রদায় যদি ক্রমাগত দুর্ব্বলতা বা কাপুরুষতার পরিচয় দিতে থাকে তবে উহা যেমন সেই সম্প্রদায়ের অনিষ্টকর, তেমনি উহা অপর সম্প্রদায়কেও মানবীয় আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিবার প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিবে। সুতরাং দুর্ব্বল ও ভীরু সম্প্রদায়কে বীর্য্যবান ও বলশালী করিয়া প্রতিষ্ঠা করা, সমগ্র সমাজ জীবনের পক্ষে কল্যাণকর এবং শ্রেয় বলিয়া তিনি বিবেচনা করিলেন।

ন্যায়সঙ্গত ভাবে সতীন্দ্রনাথ উদ্দীপ্ত হইলেন। শাসক-শ্রেণীর মধ্যস্থতার মুখোস এবার খসাইতে হইবে। সংঘাত সুরু করিবেন প্রত্যক্ষ সেই সরকারেরই বিরুদ্ধে। অজ্ঞ মুসলমান জন-সাধারণ হইল নিজেরই স্বদেশবাসী—তাহাদের ভুল একদিন ভাঙ্গিবেই। কিন্তু বৃটিশ সরকারের কূট কৌশলের প্রতিরোধ করিবার সময় হইল উপস্থিত।

জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক ছিলেন সতীন্দ্রনাথ। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কার্য্যই ছিল কংগ্রেসের নীতি। সুতরাং বাহ্যত হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ গ্রহণ করিয়া কি প্রকারে সংঘর্ষের পথে তিনি অগ্রণী হইবেন? স্মরণ করিলেন গান্ধীজীর কথা—যেখানে অসহায়, নিরুপায় ও দুর্ব্বল জন-সমাজের উপর অন্যায়, অবিচার ও নিষ্ঠুর অপমান সংঘটিত হয় প্রকৃত কংগ্রেসকর্ম্মীর স্থান থাকিবে অসহায় উৎপীড়িত পক্ষে। রাজনৈতিক ন্যাকামীর ছুঁৎমার্গের ভয় তাহার কোন দিনই ছিল না,—নৈতিক কংগ্রেসীর

অধঃপতনের সম্ভাবনা রহিয়াছে সংখ্যালঘুদের ন্যায়সঙ্গত দাবীর পক্ষাবলম্বন করিলে—সে চিন্তা তিনি করিতেন না।

লোকের মান, সম্মান, স্তুতি বা নিন্দার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর তাঁহার হইত না—মনের আপন বেগে সত্য পথে চলিত তাঁহার কর্ম্মপ্রবাহ। সুতরাং স্থির করিলেন সতীন্দ্র-নাথ যে বৃটিশ সরকারের প্রসারিত কূটনৈতিক জাল ছিন্ন করিতেই হইবে। তিনি সত্যাগ্রহ করিবার সংকল্প করিলেন।

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ ছিল তাহার জীবনের এক বিরাট সিদ্ধান্ত। এতবড় এক গুরুতর কার্য্যের আয়োজনের মধ্যে তাঁহার কঠোর জীবনের প্রস্তুতির পরিচয় প্রকাশ পাইল। সাম্প্রদায়িক সমস্যা লইয়া সমগ্র ভারতের নেতৃবৃন্দ ছিলেন বিভ্রান্ত। তাহারই এক নূতন সমাধানের প্রচেষ্টা করা হইবে প্রদেশের প্রান্তদেশে এই দুর্গম ক্ষুদ্র সহর পটুয়াখালীতে।

এ সিদ্ধান্ত ছিল অচিন্তনীয়। অনাগত এক ভবিষ্যতের আশা-নিরাশার প্রতি দৃকপাত না করিয়া জ্বলন্ত বিশ্বাসের মাধ্যমে সত্য দৃষ্টির আলোকে আপন পথের সন্ধান তিনি পাইলেন। যতই কঠোর বা অসম্ভব হউক না কেন সে পথ তাহা অতিক্রম করিবার দুর্জ্জয় শক্তি ও অফুরন্ত সাহস ছিল তাঁহার পূর্ণ মাত্রায়।

এই সত্যাগ্রহ লোকের বা অর্থের কতটুকু সহায়তা কাহার নিকট হইতে তিনি পাইতে পারেন—এ চিন্তার দৌর্ব্বল্য তাঁহাকে মুহূর্ত্তের জন্যও আচ্ছন্ন করিল না। তিনি অন্তরের সহিত বিশ্বাস

করিতেন—কর্ম্মের উদ্দেশ্য যদি সত্যের ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় এবং নিষ্ঠার সহিত যদি তাহা হয় প্রতিপালিত, তবে এমন কোন শক্তি নাই যে উহার সফলতাকে ব্যর্থ করিতে পারে। কর্ম্মের আদর্শে এবং সত্যের আবেগে না চাহিতেও আসিবে অর্থ, আসিবে লোক, আসিবে সর্ব্বসহায়তা—এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল অতীব দৃঢ়।

সর্ব্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত পথের উপর জনসাধারণের যাতায়াতের স্বাভাবিক অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে অন্যায় অযৌক্তিক বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে। সুতরাং ঠিক করা হইল এবারও আগামী জন্মাষ্টমীর চিরাচরিত শোভাযাত্রাকে স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করা হইবে, যথারীতি পূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য বৎসরের ন্যায়—বাধা যদি আসে, নিষিদ্ধ যদি হয় শোভাযাত্রা, তবে সে আইন অস্বীকার করা হইবে, অমান্য করা হইবে সরকারী আদেশ।

বরিশালের তরুণ সমাজের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগ্রত হইল। অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কট ও বিপদাশঙ্কার মধ্যে যেন ছিল অদ্ভুত আকর্ষণ। সতীন্দ্রনাথের ধীর, গম্ভীর ও দৃঢ় পদক্ষেপ, অকম্পিত উজ্জ্বল চক্ষু যুগল, পূর্ণ আত্ম-বিশ্বাসের সরল স্পষ্ট বাক্যাবলী—সমস্ত তরুণ সমাজের আত্মিক শক্তিকে যেন করিতেছিল চুম্বকের ন্যায় আকৃষ্ট।

১৯২৬ সনের আগষ্ট মাসে জন্মাষ্টমীর দিবস অপরাহ্ণে সুরু হইল শোভাযাত্রা। বিরাট পুলিশদল কর্ত্তৃক শোভাযাত্রা বাধা-

প্রাপ্ত হইল। অদূরস্থিত মসজিদ প্রাঙ্গণ হইতে নির্গত কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্ত্তৃক শোভাযাত্রা আক্রান্ত হইল। পুলিশের সম্মুখে এই আক্রমণ চলিলেও, পুলিশ শুধু গ্রেপ্তার করিল সমুদয় শোভাযাত্রীদের। সত্যাগ্রহের প্রথম দিনের দৃশ্য এইভাবেই উদ্‌যাপিত হইল।

সুরু হইল—প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে শোভাযাত্রা সহকারে নিষিদ্ধ স্থানে আসিয়া নির্দ্ধারিত সত্যাগ্রহী কর্ত্তৃক আইন অমান্য করতঃ গ্রেপ্তার বরণ করা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এমনি ধারা সত্যাগ্রহ ও গ্রেপ্তার চলিতেছিল নিরবচ্ছিন্ন ভাবে।

পূজার ছুটি আসিয়া গেল। ক্ষুদ্র সহরের উচ্চ বিদ্যালয় দুইটী, আদালত ও ফৌজদারী বন্ধ থাকার দরুণ সহর যেন জন-শূন্য। প্রায় দুইমাস ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত হইয়াছে। সুদুর কলিকাতার পত্রিকায় এই সত্যাগ্রহের সংবাদ প্রকাশিত হইলেও বিস্তারিত সংবাদ পরিবেশনের ছিল প্রতিবন্ধকতা। স্থানীয় তরুণ ও বালক সহকর্ম্মীগণ একে-একে হইতেছিল কারারুদ্ধ। প্রাত্যহিক আইন-অমান্যের সত্যাগ্রহী সংগ্রহ করা হইল ক্রমশঃ কঠিন ব্যাপার। এমন কি বহুবার বিশিষ্ট সত্যাগ্রহের সময় হয়তো অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সত্যাগ্রহী সংগ্রহ তখনও হয় নাই। এমনি কঠিনতম পরিস্থিতির উদ্ভব দেখা দিল সম্মুখে।

পরাজয় ও নিরুৎসাহের পরিবেশ এমনিভাবেই হইতেছিল সৃষ্টি—লোক নাই, অর্থ নাই, চতুর্দ্দিকেই ছিল নিরুৎসাহের আবহাওয়া—তরুণ সহকর্ম্মীগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। ভগ্ন

হৃদয়ে তাহারা নিবেদন করিল তাহাদের নেতা সতীন্দ্রনাথের নিকট—"এখন উপায় ?"

গম্ভীরভাবে আপন মনে পাদচারণ করিতে করিতে বলিলেন সতীন্দ্রনাথ—"উপায় ? এগিয়ে যাওয়া। কেউ যদি না আসে একলাই এগিয়ে যাব। টাকা পয়সা, লোক-জন আসবেই—দরকার হ'লে মাটি ফুঁড়ে আসবে। পথ যখন সত্য—জয় তখন হবেই।"

প্রাণের উৎসারিত এই সত্যবাণী নূতন উৎসাহ উদ্দীপনা আনিয়া দিল তাঁহার সহকর্ম্মীদের অন্তরে। সত্যাগ্রহী কর্ম্মীর অভাবও পূরণ করা হইল বিচিত্র ভাবে এক একটি তরুণ দশ বার বার গ্রেপ্তার বরণ করিয়া—গ্রেপ্তারের পরেই জামিনে মুক্ত হইয়া পুনরায় দিত ধরা। এই গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে সতীন্দ্রনাথের তরুণ সহকর্ম্মীদের মধ্যে শ্রীমনোরঞ্জন পাল, আশু মুখার্জ্জী, হরিপদ দাস প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সত্যাগ্রহী সংগ্রহের প্রাথমিক দুর্ব্বলতাকে করা হইল অতিক্রম এমনি ভাবে।

১৯২৬ সনে গৌহাটীতে বসিয়াছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশন। সমগ্র রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের নিকট উপনীত হইলেন সতীন্দ্রনাথ। সাম্প্রদায়িক সমস্যার বিরাট প্রশ্নের সমাধানের জন্য। যদি সংগ্রাম করাই প্রয়োজন বোধ তবে উহা হওয়া উচিত ছিল কলিকাতার ন্যায় মহানগরীর উপর—কাহারও মনে এমনও ছিল দ্বিধা। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের

ধারণা ছিল অন্যপ্রকারের। সংখ্যালঘুরা যে স্থানে শতকরা পাঁচ জন, সেখানেও তাহারা আত্মসম্মানসহ আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে সেই আত্মবিশ্বাসের শিক্ষা দিবার জন্য প্রয়োজন এই প্রকারেরই শক্তির সংঘাত।

রাজনৈতিক বন্ধুগণ প্রশ্ন করিলেন—'স্বাধীনতায় ব্যাপৃত সংগ্রামের দিকেই রয়েছে আমাদের মন ও গতি ; পথের মাঝে ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে জড়িয়ে পরলে আমাদের গতি ও শক্তি ব্যাহত হবে না কি ?"

সুস্পষ্ট ছিল তাঁহার উত্তর—"ছোট বড় সংগ্রামের ভিতর দিয়ে জাতিকে ও কর্ম্মীকে হ'তে হয় সংগ্রামশীল, দৃঢ়চেতা ও আত্ম-বিশ্বাসী। আদর্শের প্রচার শুধু মুখে হয় না—হয় কর্ম্মের মধ্যে, বিপদলাঞ্ছনার মধ্যেই হয় তার প্রতিষ্ঠা।"

দৃঢ়চেতা, আত্মবিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ কর্ম্মকুশলী, সতীন্দ্রনাথের প্রতি সমগ্র কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের দৃষ্টি হইল বিশেষভাবে আকৃষ্ট। সমগ্র ভারতের জনসাধারণের অন্তরে স্পর্শ করিল এই সত্যাগ্রহের বাণী। দূর-দূরান্ত হইতে আসিল অর্থ—আসিল লোকজন। দেখিতে দেখিতে ক্ষুদ্র পটুয়াখালী হইয়া উঠিল সমগ্র ভারতের গণ-সংগ্রামের পীঠস্থান। ক্রমে ক্রমে প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দের পদার্পণ হইল সুরু পটুয়াখালীতে।

অমৃতবাজার পত্রিকার পীযূষকান্তি ঘোষ ক্ষীণ দেহ লইয়া উপস্থিত হইলেন—ঘোষণা করিলেন আবশ্যক হইলে তাঁহার অস্থি কয়খানাও উপহার দিবেন ওই সত্যাগ্রহ যজ্ঞে। উৎসাহের

প্রবল আবেগে ধারাবাহিকভাবে কতিপয় প্রবন্ধ লিখিলেন তাঁহার অমৃতবাজার পত্রিকায়—সত্যাগ্রহ এবং সতীন্দ্রনাথ বিষয়ে। সতীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সেই প্রবন্ধই ছিল সর্ব্বপ্রথম প্রচার।

পঞ্জাব হইতে আসিলেন ভাই পরমানন্দ, আসিলেন ডাঃ মুঞ্জে, পদ্মরাজ জৈন আর আসিলেন মাখনলাল সেন, অমর চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। সুদূর টোকিও হইতে শুভেচ্ছা পাঠাইলেন বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। আশীর্ব্বাদ পাঠাইলেন মদনমোহন মালব্য। লালা লাজপৎ রায়, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সুভাষচন্দ্র, জে, এম, সেনগুপ্ত, সুরেশ মজুমদার প্রভৃতির নিকট হইতে আসিল শুভেচ্ছা।

প্রতিক্রিয়াশীল সংখ্যাগুরু নেতৃবৃন্দ ছিলেন না নিষ্ক্রিয়। অজ্ঞ, সরল মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে তীব্র সাম্প্রদায়িকতার প্রচার চলিতেছিল ব্যাপকভাবে। যে নেতৃত্ব ত্যাগের ভিত্তিতে, সেবার আদর্শে থাকে না প্রতিষ্ঠিত, উহা স্বভাবতই থাকে দুর্ব্বল সুতরাং হয় হিংস্র। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ অবলম্বন করিয়া যে বিপুল গণ-বিক্ষোভ সৃষ্টি হইয়াছে সমগ্র দেশে, উহার প্রতিরোধের জন্য এমন কোন সরল, স্পষ্ট দৃঢ়পন্থা উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না সেইসব প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃবৃন্দ। কাজেই অনতিবিলম্বে বিভিন্ন পল্লীঅঞ্চল হইতে সাম্প্রদায়িক উচ্ছৃঙ্খলতার সংবাদ আসিতে থাকিল। সরকারী কার্য্যাবলী দৃষ্টে মনে হইল তাহারা যেন এবিষয়ে নিতান্তই উদাসীন।

সতীন্দ্রনাথ তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম-প্রচেষ্টার মধ্যে তাঁহার সহকর্ম্মীদের বিষয়ে একটী বিশেষ নীতি মানিয়া চলিতেন। তিনি চাহিতেন, প্রত্যেক কর্ম্মীর মধ্যে জাগ্রত হউক আত্মনির্ভরশীলতা, তেজস্বিতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, বীর্য্যবত্তা এবং সুকৌশলী-সংগঠনপটুতা। সুতরাং এই সত্যাগ্রহ সুরু হইবার পর হইতেই উহার দৈনন্দিন পরিচালনার ভার দিলেন তাঁহার সহকর্ম্মীদের উপর। সেই সব সহ-কর্ম্মীদের নিকট থাকিত প্রয়োজনীয় অর্থ এবং যাবতীয় কার্য্যের ব্যবস্থা ও অধিকার, দৈনন্দিন কার্য্যে কোন প্রকারের হস্তক্ষেপ তিনি করিতেন না।

সত্যাগ্রহ প্রারম্ভেই তাঁহার সহকর্ম্মী শ্রীজগদীশচন্দ্র সরকারকে স্থানীয় সম্পাদকরূপে নির্ব্বাচিত করা হয় এবং পরে সতীন্দ্র-নাথের সহতীর্থ বন্ধু শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেনগুপ্তই এই সংগ্রামের শেষ পর্য্যন্ত কর্ণধাররূপে নিয়োজিত থাকেন।

একইভাবে বরিশাল সহরে তাহার বিশিষ্ট সহকারী ৺নির্ম্মল দাশগুপ্ত ও ৺তারাপদ ঘোষের উপর ছিল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ক্ষমতা। কোথা হইতে এবং কি ভাবে কখন কত অর্থ আসিত, কাহারা সত্যাগ্রহ করিতে কোন স্থান হইতে আসিত—এ হিসাব সতীন্দ্রনাথ জানিতেন না বা রাখিতেন না—পূর্ণ বিশ্বাস ছিল তাঁহার সহকর্ম্মীদের প্রতি।

সত্যাগ্রহে উদ্ভূত কার্য্যের সমস্যানুযায়ী সতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীগণের কার্য্যাবলী প্রধানত দুই ধারাতে পরিচালিত

হইল—সত্যাগ্রহ পরিচালনা ও জেলাব্যাপী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা।

সত্যাগ্রহ পরিচালনা ব্যাপারে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন ব্যতীত যিনি সর্ব্বদা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রায় সর্ব্বকার্য্যে প্রধান হোতারূপে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তিনি হইলেন সতীন্দ্রনাথের অগ্রজ ৺নগেন্দ্রবিহারী সেন মহাশয়। বলিতে গেলে তাঁহার স্থিরবুদ্ধি ও কুশলী পরিচালনা পটুয়াখালীতে সেদিন সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে জয়ের পথে উন্নীত করে। সত্যাগ্রহ সংস্থার তিনি ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। তাঁহাদের পরিবারের গৃহ ছিল উন্মুক্ত সর্ব্বসময়েই। বিদেশী অতিথি অভ্যাগতের অভ্যর্থনার ভার সাধারণত তাঁহার উপরই থাকিত ন্যস্ত। যখনই অর্থের হইত অভাব তাঁহার নিকট হইতে আসিত আবশ্যকীয় অর্থ। এইরূপ বহু সহস্র অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে।

বাংলার বিভিন্নস্থানে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহের জন্য পরিভ্রমণ করিয়াছেন স্বামী জ্ঞানানন্দ, ইন্দু গুহ, কৃষ্ণ চ্যাটার্জী প্রভৃতি এবং ভারতের বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন অন্ধ্রের কর্ম্মী শ্রীপঞ্চাঙ্গী।

১৯২৭ সনের মার্চ্চ মাসে দিল্লী হইতে সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের নিকট হইতে আহ্বান পাইয়া সতীন্দ্রনাথ তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ও বরিশালের তরুণ উকিল শ্রীমন্মথ দেকে প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করেন।

মালবীয়াজীর বাড়ীতে সভা বসিয়াছে। লালা লাজপৎ রায়

ডাঃ মুঞ্জে প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ছিলেন উপস্থিত। সতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সত্যাগ্রহের আনুষঙ্গিক যাবতীয় কার্য্যাবলী তাঁহারা শ্রীযুত দের নিকট হইতে শ্রবণ করিলেন। সর্ব্বশেষে মন্মথ দে আবেদন জানাইলেন অর্থ সহায়তার জন্য।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মধ্য হইতে লালাজী একটু ক্ষোভের সহিত বলিলেন—'অর্থ এখন চাইতে এলে, সত্যাগ্রহ সুরুর আগে তো আর এলে না!' এই প্রশ্নে শ্রীযুত দেকে একটু উত্তেজিত করিল। বয়স তখন কম, তাহার উপর আসিয়াছেন সতীন্দ্রনাথের ন্যায় এক বিরাট কর্ম্মীর প্রতিনিধিত্ব করিতে, কাজেই কোন ভয়-ডর না করিয়াই নিরুদ্বেগে বলিয়া গেলেন—"এ কথার উত্তরে সতীন্দ্রনাথ কি বলতেন আমি শুধু তাই বলবো। সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে কেহ অর্থ দেবে কি দেবে না, লোকজন আসবে কি আসবে না—এ চিন্তা করে সতীন্দ্রনাথ কাজে নামেন নি। কর্ম্মের সত্যরূপই তার যথেষ্ট পরিচয়।"

প্রায় ৪০ মিঃ এমনি ধারায় বক্তৃতা শেষ করিলেন শ্রীযুত দে। পণ্ডিত মালবীয়ের উদ্যোগে অবশেষে আশ্বাস দেওয়া হইল সর্ব্বপ্রকার সহায়তার জন্য।

অতঃপর সত্যাগ্রহের অর্থকৃচ্ছ্রতার কতকটা অবসান হইয়াছিল।

সতীন্দ্রনাথের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাও ছিল অতীব চমৎকার। সাম্প্রদায়িক ছোট-খাট হাঙ্গামার সংবাদ বিভিন্ন স্থান হইতে আসিত। হাঙ্গামায় কোন প্রকারের উত্তেজনা সৃষ্টি না করিয়া বরং তাহার প্রতিরোধের প্রচেষ্টাই ছিল তাঁহার

কাম্য। সুতরাং হাঙ্গামাকারীদের তিনি বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ভাবে বিবেচনা না করিয়া—শুধু এক শ্রেণীর গুণ্ডামী বলিয়া অভিহিত করিতেন। কাজেই গুণ্ডা শ্রেণীরা যে "ভাষা" বুঝিতে সক্ষম, তিনি সেই "ভাষা" লইয়াই সাক্ষাৎ করিতেন, অর্থাৎ লাঠির আঘাতকে লাঠির দ্বারা প্রতিরোধ করা হইত। এই সব গুণ্ডামীকে প্রতিহত ও সংযত করা সম্ভব ছিল তখনই, যখন বিপক্ষদল বুঝিতে পারিত— প্রতিপক্ষের শক্তিও কম নয়, তাহারাও সুশৃঙ্খলভাবে সুসজ্জিত। অতর্কিত আক্রমণের দুর্ব্বলতা যাহাতে না থাকিতে পারে এরূপ ব্যাপক প্রস্তুতি চলিল সর্ব্বত্র।

সতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীদের মধ্য হইতে বিশেষভাবে নির্ব্বাচিত একদল কর্ম্মীর উপর ছিল এই ব্যবস্থা-পরিচালনার ভার। এই কার্য্য সম্পাদনের মধ্যে উদ্ভূত বিবিধ সংঘর্ষের মধ্যে সতীন্দ্র নাথের তরুণ সহকর্মী হীরালাল দাশ গুপ্ত, দেবেন দত্ত, শৈলেশ্বর চক্রবর্ত্তী, রবি রায়, ফনী চ্যাটার্জ্জী, সুধীন সেন, দিলীপ দাস, নলিনী দত্ত, নারায়ণ ঘটক প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এমন কি বিপদসঙ্কুল বিবিধ পরিস্থিতির মধ্যে অগ্রণী হইতেন যে সব যুবকদল, তাহাদের মধ্যে বিপুল মুখোপাধ্যায়, কিরণ দে, সুধীর আইচ, টুক্‌কা-বড়কা ভাইদের নাম উল্লেখ করা চলে।

সুদূর পল্লীর যে স্থানেই সংঘটিত হইত অত্যাচার বা হিংস্র-ব্যবহার, সেখানেই তিনি পাঠাইতেন তাঁহার তরুণ সেবক দল। মুষ্টিমেয় সেবক দলের উপস্থিতি সুদূর পল্লীতে অবস্থিত ও

আতঙ্কিত সংখ্যালঘুদের মনে আনয়ন করিত সাহস, বিশ্বাস ও একতা। আক্রমণাত্মক ছিল না সেই প্রচেষ্টা—ছিল অন্যায় আক্রমণকে প্রতিরোধ করিবার মত উপযুক্ত মানসিক বলের সঞ্চার। সংখ্যায় লঘু থাকিয়াও কিভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসের সহিত দৃঢ়তার সহিত আত্মসম্মান রক্ষা করিয়া চলিতে পারা যায়—তাহার প্রচেষ্টা চলিতে থাকিল।

* * * *

পোনাবালিয়া হত্যাকাণ্ড

বরিশাল জিলার পোনাবালিয়ার শিব মন্দির একটি অতি প্রাচীন পীঠস্থান। শিবরাত্র উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে সহস্র সহস্র হিন্দু জনসাধারণ এখানে আসেন পূজার জন্য। এই সময়ে বসে মেলা—মেলায় নানা জিনিষ হয় কেনা-বেচা।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় সে বৎসরও ১৯২৭ সনের ফাল্গুন মাসে শিবরাত্র উপলক্ষে বহু সহস্র তীর্থযাত্রী পোনাবালিয়া আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এমন সময় সংবাদ পৌঁছিল যে, উক্ত শিবমন্দিরের অদূরে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সরকারী প্রশস্ত রাস্তার পার্শ্বে নির্মিত একটী চালা-গৃহকে ঘোষণা করা হইয়াছে মসজিদ রূপে। সেই গৃহ যখন মসজিদ তখন সম্মুখস্থ রাস্তার উপর দিয়া হিন্দু তীর্থযাত্রীরা তাহাদের চিরাচরিত প্রথানুসারে সংকীর্ত্তন সহ অতিক্রম করিবে কিরূপে ?

এই প্রকারের যে অন্যায় দাবী আসিল, সেই দাবীকে বল-প্রয়োগ দ্বারা কার্য্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে

বিশেষ এক শ্রেণীর লোক অস্ত্রসস্ত্রে সজ্জিত হইতেছিল বলিয়া সতীন্দ্রনাথের নিকট বরিশালে সংবাদ পেঁৗছিল।

এই অবস্থায় হিন্দু তীর্থ-যাত্রীরা স্বভাবতই হইলেন ভীত, সন্ত্রস্ত ও ব্যাকুল। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করিয়া সতীন্দ্র নাথ অবিলম্বে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাণ্ডীর নিকটে এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে অনুরোধ করা হইল অনতিবিলম্বে এই আক্রমণাত্মক প্রস্তুতি যাহাতে কোন প্রকারে বিস্তৃতি লাভ করিতে না পারে তাহার দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হউক। কিন্তু জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট গুরুতর পরিস্থিতিকে লঘু করিয়াই দেখিলেন।

অবস্থানুসারে দ্রুত কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করিয়া পুলিশ-সুপার মিঃ টেগর ও মিঃ ব্লাণ্ডী একদল সসস্ত্র পুলিশবাহিনী সহ উপস্থিত হইলেন পোনাবালিয়ায় শেষ মূহুর্ত্তে।

এদিকে সতীন্দ্রনাথও একদল যুবককে পাঠাইলেন উক্ত স্থানে স্থানীয় তীর্থ-যাত্রীদের মনে বল-ভরসা দিবার জন্য।

অবস্থা দৃষ্টে কর্ত্তৃপক্ষ এবার প্রমাদ গণিলেন। সরকারী ভেদনীতির কূটনৈতিক জালে এবার নিজেরাই জড়াইয়া পড়িলেন। তোষণ ও পোষণ নীতির ফলে এক শ্রেণীর লোকের মনে উচ্ছৃঙ্খলতার ভাব কতদূর পর্য্যন্ত দৃঢ়ীভূত হইতে পারে তাহারই উৎকৃষ্ট উদাহরণ উপস্থিত হইল। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইয়াই ছিল যে, মসজিদের নাম করিয়া যত প্রকারের অনাচার অনুষ্ঠিত হউক না কেন সরকারী সহায়তা থাকিবেই তাহাদের পক্ষে। শুধু তাই নয় এই শ্রেণীর লোকের

কার্য্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিবার মত কোন নেতৃত্ব ছিল না, যে নেতৃত্ব ছিল, তাহারা কেবল সাম্প্রদায়িক ইন্ধন বৃদ্ধি করিবারই ক্ষমতা রাখিতেন কিন্তু প্রয়োজনমত উহাকে আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতা বা শক্তি ছিল না।

নোয়াখালী জিলা হইতে আগত এবং এতদ্দেশীয় অবস্থাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন উগ্র মৌলবীর নেতৃত্বে বিরাট একটী সশস্ত্র জনতা হিংসায় উন্মত্ত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল সেই তথাকথিত মসজিদের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে। ক্ষণে ক্ষণে উল্লাসধ্বনি দ্বারা সেই জনতাকে করা হইতেছিল উত্তেজিত। বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র আন্দোলিত করিয়া বিক্রম ও শৌর্য্য প্রকাশ করা হইতেছিল। সে ছিল যেন একটা ভয়ানক বিপর্যয়ের পূর্ব্বাভাষ।

কিন্তু সব বিষয়েরই শেষ আছে। সদ্য নির্ম্মিত মসজিদের স্বীকৃতি দ্বারা হিন্দু তীর্থ-যাত্রীদের পুরুষানুক্রমে প্রচলিত রীতি-নীতিকে আঘাত দিতে মিঃ ব্লাণ্ডী সাহসী হইলেন না। সুতরাং উদ্ধত সমগ্র জনতাকে তিনি বারবার অনুরোধ করিলেন স্থান ত্যাগ করিতে। সরকারী কর্ম্মচারীগণ নানা প্রকারে জনতাকে অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কোনই ফল হইল না। সেই উগ্র মৌলবী ধর্ম্মের নাম করিয়া যেহাদ ঘোষণা করিয়া অজ্ঞ ও সরল জনতাকে প্ররোচিত করিতে থাকিল। অবস্থা যখন একেবারেই আয়ত্তের বাহিরে যাইতেছিল তখন জেলা ম্যাজি-ষ্ট্রেটের হুকুমে উক্ত মৌলবীকে করা হইল গ্রেপ্তার। কিন্তু এই কার্য্য করা হইল বহু বিলম্বে সুতরাং এই গ্রেপ্তারে যে ফল আশা

করা গিয়াছিল তাহার পরিবর্ত্তে উত্তেজনা আরও তীব্রতর হইয়া উঠিল। সেই সশস্ত্র জনতা হুঙ্কার দিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল।

সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হইল এই জনতা বে-আইনী; অবিলম্বে উহা ছত্রভঙ্গ করা না হইলে সরকারী বলের প্রয়োগ হইবে। কিন্তু কে শোনে সেই কথা। উগ্রতার তাণ্ডবে স্থান, কাল বা অবস্থার ফলাফল বিস্মৃত হইয়া নিক্ষিপ্ত হইল পুলিশের প্রতি বল্লম, বর্ষা প্রভৃতি। সাবধান করিয়া দেওয়া হইল জনতাকে যে প্রয়োজন হইলে গুলী বর্ষণের দ্বারা গতি রুদ্ধ করা হইবে। সেই মৌলবী ব্যঙ্গ করিয়া প্রচার করিল "লাট সাহেবের হুকুম ছাড়া গুলী ছাড়িবার অধিকার কাহারও নাই।"

তীব্র হুঙ্কারে সেই মূর্খ জনতা আগুনের মধ্যে দিল ঝাঁপ, সুরু হইল আক্রমণ। একটী বর্ষা পুলিশ সুপারের কর্ণের পার্শ্ব দিয়া ছুটিয়া গেল। আর নয়। হুকুম হইল—"Fire"—গুলী কর। দেখিতে দেখিতে গুলীর পর গুলী চলিল। অস্থির, উন্মত্ত সেই জনতা চকিতে হইল বিহ্বল, ব্যাকুল। দিক্‌বিদিক জ্ঞানহীন ভাবে যে যেদিকে পারিল সে সেই দিকে ছুটিল। স্থানে স্থানে পড়িয়া রহিল নিহতের মৃত দেহ। আর ছিল আহতের আর্ত্ত ধ্বনি। মোট ১৯ জন হইল নিহত। আমাদের দেশেরই কতকগুলি অসহায় অবোধ লোকের হইল অকাল মৃত্যু! এজন্য যাহারা দায়ী ইতিহাসে তাহাদের নাম মসি-লিপ্ত হইয়াই রহিল।

এই সর্ব্বনাশা ঘটনার জন্য সতীন্দ্রনাথ দায়ী করিলেন বৃটিশ সরকারের কূটনীতির। তোষণ ও পোষণ-নীতির ফলেই উদ্ভূত

হইল এ হেন মর্ম্মন্তুদ ঘটনা। সকলেই ভাবিল ইহার শেষ কোথায়?

দুর্জ্জয় অভিমানে সতীন্দ্রনাথের অন্তর জ্বলিয়া উঠিল। ক্ষুব্ধ ও বিচলিত কণ্ঠে সতীন্দ্রনাথ অভিযুক্ত করিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ব্লাণ্ডীকে—"You could well avoided this messere if some preventive arrests were made earlier."—পূর্ব্বেই যদি কয়েকজনকে আটক-বন্দী করা চলিত তবে এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কোন প্রয়োজনই হইত না।

সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টি ছিল পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের পরিণতির দিকে। সুতরাং অহিংস সত্যাগ্রহকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য দরকার হইল কূট বুদ্ধির খেলা। অহিংস আন্দোলনকে হিংসার গ্লানিতে বিষাক্ত করিতে পারিলে, আন্দোলনকে বিপথগামী করাইয়া উহাকে ধ্বংস করা চলিবে অনায়াসে। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের আন্দোলন যেমন ছিল অহিংস, অপর দিকে আত্মরক্ষার্থে প্রযুক্ত বল প্রয়োগের আইন-স্বীকৃত নীতিও তিনি স্বীকার করিতেন। সরকারী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যেখানে অচল সেখানে আক্রান্ত সমাজ স্বকীয় শক্তি প্রয়োগে আত্মরক্ষা ব্যতীত আর কী বা করিতে পারে! সুতরাং সতীন্দ্রনাথের এই দুর্ব্বল স্থানে আসিল আঘাত। দেখিতে দেখিতে বহু অংশে সংঘটিত হইল বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ। আক্রান্ত পক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে দেখিয়া সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত করিলেন—ইহারা হিংস-পন্থী—সিদ্ধান্তের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপকভাবে শাস্তির ব্যবস্থা হইল।

পটুয়াখালী সহরের মুষ্টিমেয় কয়েক সহস্র হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ব্যাপকভাবে শাস্তিমূলক কর (Punitive Tax) বসান হইল। এই করের দ্বারা বহু সংখ্যক অতিরিক্ত সসস্ত্র পুলিশ-বাহিনী মোতায়েন করা হইল সহরের বিভিন্ন রাস্তায়। কর অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সমাজের গণ্যমান্য এবং বিশেষতঃ যাহারা সতীন্দ্রনাথের সমর্থক তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়া হইল। ভরসা ছিল যে, আক্রমণ-মূলক করের চাপে ক্লিষ্ট হইয়া স্থানীয় হিন্দু নেতৃবৃন্দ সতীন্দ্র-বিরোধী হইয়া উঠিবেন। একবার যদি সংখ্যালঘুদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরান যায় তবে সতীন্দ্রনাথের আন্দোলন ধ্বংস করা বিশেষ কষ্টকর হইবে না। সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের মনোভাব ছিল এই প্রকারের।

* * * *

১০৭ ধারার গ্রেপ্তারে দণ্ড

প্রতি বৎসর দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে বরিশালের লাকুটিয়া গ্রামে বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক উৎসব হয়। এবারকার উৎসবের আনুষ্ঠানিক ব্যাপারে বাধা আসিল। ইহার ফলে একপক্ষ হইল মর্ম্মাহত বিক্ষুব্ধ এবং অপর পক্ষ হইল উত্তেজিত। এরূপ অবস্থায় সতীন্দ্রনাথের সহায়তা প্রার্থনা করিলেন স্থানীয় বিক্ষুব্ধ অধিবাসীগণ। এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহার নীতি ছিল সুস্পষ্ট—বল প্রয়োগের ভয়ে ভীত হইয়া যে কোন সম্প্রদায়ের চিরাচরিত আচার-অনুষ্ঠান বর্জ্জন করিবার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। সুতরাং তিনি প্রস্তুত হইলেন নিজে লাকুটিয়া যাইয়া অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে।

অবস্থা যখন এই প্রকারের তখন জেলা কর্ত্তৃপক্ষ তাহাদের স্বাভাবিক নীতি হিসাবে ১৯২৭ সনের ১৬ই মার্চ্চ তারিখে ঘোষণা করিলেন ১৪৪ ধারা। কর্ত্তৃপক্ষের বিচারে বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায় এবং উত্তেজিত সম্প্রদায় যেন একই পর্য্যায়ভুক্ত। সুতরাং উক্ত ব্যাপারে সতীন্দ্রনাথের মনোভাব কিরূপ হইতে পারে উহা যাচাই করিবার জন্য আয়োজন করা হইল এক অপরূপ ব্যবস্থার।

১৮ই মার্চ্চ অপরাহ্নে মিঃ ব্লাণ্ডীর স্ত্রী সতীন্দ্রনাথকে তাঁহার বাংলোতে "চা-পানের" আমন্ত্রণ করিলেন। চায়ের আসরে উপস্থিত ছিলেন মিঃ ব্লাণ্ডী ও পুলিশ-সুপার মিঃ টেলার।

বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনার পর মিঃ ব্লাণ্ডী জানিতে চাহিলেন লাকুটিয়া ব্যাপারে সতীন্দ্রনাথের অভিপ্রায়। বরাবরই তিনি ছিলেন অকপট, স্পষ্টবাদী ও দৃঢ়চেতা। সুতরাং অকপটে প্রকাশ করিলেন তাঁহার কার্য্য-পরিকল্পনা—অর্থাৎ প্রয়োজন হইলে লাকুটিয়ায় সরকারী আইন অমান্য করা হইবে।

বৃটিশ জাতির দুইজন উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিপুণ ভাবে প্রসারিত কূট-কৌশলের ফাঁদ বিশেষ কার্য্যকরী হইল। সতীন্দ্রনাথের অলক্ষ্যে ইঙ্গিত চলিয়া গেল পূর্ব্ব পরিকল্পিত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করিতে।

বিশেষভাবে আদর-আপ্যায়নের পর সতীন্দ্রনাথ নির্গত হইলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলো হইতে। কিছুদূর অগ্রসর হইতে না হইতেই স্থানীয় ডি. এস, পি আসিয়া তাঁহাকে প্রদর্শন করাই-লেন সদর মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক প্রেরিত গ্রেপ্তারী পরোয়ানা।

ফৌজদারী বিধানের ১০৭ ধারা মতে তিনি হইলেন বন্দী। অবিলম্বে তাঁহাকে স্থানীয় কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কি বিচিত্র পরিকল্পনা—ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী আদর আপ্যায়ন এবং তৎপর কারাগারে নিক্ষেপ!

বিচারসাপেক্ষ জামীনে মুক্তির জন্য আবেদন করা হইল। কিন্তু তাঁহার মুক্তির জন্য জামীন বাবদে দাবী করা হইল ৫০,০০০ হাজার টাকার। সুতরাং ইহা মুক্তি না দিবারই ছিল নামান্তর।

জেলা জজের আদালতে আপীল করা হইল এই জামীন-নামার বিরুদ্ধে। তখন জেলা জজ ছিলেন একজন সৎসাহসী বাঙ্গালী জজ। উভয় পক্ষের শুনানী শ্রবণের পর তিনি হুকুম দিলেন মাত্র ৫০০ শত টাকার জামীন গ্রহণ করিয়া সতীন্দ্রনাথের মুক্তি-দান। বজ্রপাতের ন্যায় এই সংবাদ সরকারী মহলে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। এই ঘটনারই কিছুদিন বাদে সংবাদ পাওয়া গেল যে উক্ত জজকে তারযোগে বদলীর হুকুম করা হইয়াছে নোয়াখালীতে যাইবার। বরিশাল হইতে নোয়াখালী স্থানান্তর মনে হয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থারই এক বিভিন্ন রূপ।

মহকুমা হাকিম মিঃ জে, কে, বিশ্বাসের আদালতে হইবে বিচার। সতীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থনের জন্য এক বিশিষ্ট আইনজীবী কলিকাতা হইতে আনয়ন করিবার জন্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ শ্রীযুত মন্মথ দেকে পাঠাইলেন কলিকাতায়। কিরণশঙ্কর রায় ও শ্রীযুত মাখনলাল সেনের সুপারিশসহ শ্রীযুত দে আসিলেন হাইকোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৌঁসুলী মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জী মহাশয়ের নিকট। মিঃ

চ্যাটার্জ্জী সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"Satins name is enogh for me"—সতীনের নামই আমার কাছে যথেষ্ট। বিনা দ্বিধায় তিনি স্বীকৃত হইলেন সতীন্দ্রনাথের পক্ষ সমর্থনের জন্য।

অন্যান্য সাক্ষীদের মধ্যে প্রধানতম সাক্ষী ছিলেন মিঃ ব্লাণ্ডী ও মিঃ টেলর। উক্ত চায়ের আসরের কতিপয় ঘটনাবলীবিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপন করিতে চাহিলেন মিঃ চাটার্জ্জী কিন্তু সতীন্দ্রনাথ কিছুতেই স্বীকৃত হইলেন না বেপরোয়াভাবে মিঃ ব্লাণ্ডীকে অপদস্থ করিতে, তিনি বলিলেন—ইহা একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার।

অবশেষে ঐ বিষয়ে মিঃ চাটার্জ্জী কতিপয় প্রশ্ন লিখিতভাবে সতীন্দ্রনাথের নিকট প্রেরণ করিলেন জেলখানায় তাঁহার বিবেচনার জন্য।

সতীন্দ্রনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য এই যে উহাতে ছিল না নীচতা বা হীনতা। সংগ্রাম যদি করিতে হয় তবে উহা হইবে সম্মুখভাগে—পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করা তাঁহার ছিল বিশেষ ঘৃণার বস্তু। সুতরাং ব্যক্তিগত ব্যাপার সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়া মিঃ ব্লাণ্ডীকে সর্ব্বসমক্ষে অপমানিত ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়া আপন মুক্তি আনয়ন করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না।

সতীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে মিঃ ব্লাণ্ডী আসিলেন জেলখানায় সতীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে। জেল অফিসে অন্য কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। মিঃ চাটার্জ্জী কর্ত্তৃক প্রেরিত সেই ৫টি প্রশ্ন সম্বলিত পত্রখানি সতীন্দ্রনাথ প্রদান করিলেন মিঃ ব্লাণ্ডীকে,

বলিলেন—উহার উত্থাপনে তাঁহার কোন ব্যক্তিগত অসুবিধা রহিয়াছে কি না। লিখিত প্রশ্নসমূহ পাঠ করিতে করিতে মিঃ ব্লাণ্ডীর লাল মুখ আরও লাল হইয়া উঠিল। লজ্জায় সংকুচিত হইয়া নির্ব্বাকভাবে কপোল-ন্যস্ত হস্ত তুলিয়া বারংবার সমস্ত মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন। মুখে কোন উত্তর নাই। সতীন্দ্রনাথ বুঝিলেন যে প্রতিটি প্রশ্ন উত্থাপনেই রহিয়াছে তাঁহার মৌন আপত্তি। শুধু মাত্র একটী কথা উচ্চারণ করিলেন মিঃ ব্লাণ্ডী—'After all I am the servent of the Government'—আমি তো সরকারী ভৃত্য মাত্র।" সতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"বেশ তাই হোক, এ প্রশ্নগুলো তোলা হবে না।"

অন্য কোন কথা না বলিয়া লজ্জিত কুণ্ঠায় মিঃ ব্লাণ্ডী জেল-খানা হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

এই প্রশ্নসমূহ উত্থাপন না করিবার জন্য সতীন্দ্রনাথের এক-গুঁয়েমী দর্শনে মিঃ চাটার্জ্জী প্রথমতঃ বিস্মিত ও বিরক্তিবোধ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে আবার এই কারণেই তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইলেন সতীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁহার উদারতা দর্শনে।

মহকুমা হাকিম মিঃ জে, কে, বিশ্বাস এক অদ্ভুত রায় দিলেন। গান্ধীজীর সেই ঐতিহাসিক বিচারের রায়ের মতই। সে রায়ে সতীন্দ্রনাথের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া লেখেন—'A man of great magnetic parsonality and starling morality'.

কিন্তু বিচার করিলেন, সতীন্দ্রনাথকে এক বৎসরের জন্য মুচলেকায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে, অন্যথায় এক বৎসর সশ্রম

কারাদণ্ড। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট মুচলেকা না হওয়ার জন্য সতীন্দ্রনাথকে অগৌণে প্রেরণ করা হইল কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী জেলে কারাদণ্ড ভোগ করিবার জন্য।

*   *   *   *

প্রেসিডেন্সী জেলে তৈলের ঘানির শাস্তি

সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করিবার জন্য সতীন্দ্রনাথকে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হইল। ইংরেজ জেলার কাগজ-পত্র দৃষ্টে দেখিলেন যে নব আগন্তুক ১০৭ ধারার দরুণ সশ্রমদণ্ডে দণ্ডিত একজন সাধারণ কয়েদীমাত্র। সুতরাং কার্য্যসক্ষম শক্তি-মান সতীন্দ্রনাথকে পাঠান হইল তৈলের ঘানি টানিবার জন্য!

জেলের অভ্যন্তরে সশ্রমদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের যেসব কঠিন কার্য্যের ব্যবস্থা ছিল তাহার মধ্যে সরিষার তৈলের ঘানি টানার ব্যবস্থা ছিল সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন কার্য্য। কাজেই প্রায় অন্ধকার একটী প্রকাণ্ড এবং চতুর্দ্দিক-আবদ্ধ একটী গৃহে তাহাকে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় সারি সারি ঘানিতে দলে দলে কয়েদী ঘানি টানিতেছিল। সিপাহি-জমাদার কয়েদি-মেটের হেপাজতে সতীন্দ্রনাথকে অর্পণ করিয়া বলিল—"ইস্‌কো লগা দো কোই ঘানিমেঁ—ঔর জমা করলো।"

ইতিপূর্ব্বেই সাধারণ কয়েদীর পোষাক পরিহিত থাকায় অবয়বে তাঁহাকে সাধারণ কয়েদী শ্রেণী হইতে পৃথকরূপে বুঝিবার কোন উপায় ছিল না। সুতরাং দৈনন্দিন স্বাভাবিক রীতি রক্ষায় দীর্ঘ বিপুলকায় কয়েদি-মেট তাহার আভিজাত্যপূর্ণ ভাষায়

সতীন্দ্রনাথকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—"এই শালা, এ্যাসি খরা ক্যোঁ হ্যায় ? হাত লগা দো।"

সতীন্দ্রনাথ রহিলেন নিরুত্তর।

কয়েদি-মেটের উচ্চ-ক্ষমতার মোহে আঘাত পড়িল—"অরে শালে, শুয়োরকে বচ্চা, অভিতর খরা হ্যঁায়" ? এই বলিয়া হুঙ্কার দিয়া সতীন্দ্রনাথের ঘাড়ের উপর লম্ফ দিয়া পড়িয়া তাঁহাকে ঘানির লোহার রডের সহিত যুক্ত করিয়া দিল। চকিতে সম্বিৎ আনয়ন করিয়া সতীন্দ্রনাথ দৃপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"হম্ ইহ কাম নহী করেঙ্গে, বোলো তুম্হারা সাহবকো।"

এত বড় কথা কোন কয়েদী জেলখানার এমন কঠিন স্থানে কখনও উচ্চারণ করিতে পারে ইহা ছিল উক্ত কয়েদি-মেটের অভিজ্ঞতার বাহিরে। অন্তরের বিস্ময় চাপিয়া সে বলিয়া উঠিল—"ক্যা কাম নহী করেগে—তুমহারা বাপকো করনা পরেগা।" এই বলিয়া গুম গুম করিতে করিতে সিপাহী জমাদারের নিকট নালিশ করিতে চলিয়া গেল।

দণ্ডপ্রাপ্ত সাধারণ কয়েদী হইলেও তাহাদের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি, দয়া-মায়া ও সহানুভূতি প্রভৃতি গুণাবলীর প্রকাশ পাইয়া থাকে। কাজেই সতীন্দ্রনাথের এই কার্য্য অস্বীকার করিবার ফলে যে গুরুতর লাঞ্ছনা বর্ষিত বইতে পারে সেই চিন্তায় ব্যথিত হইয়া পার্শ্বস্থ ঘানি হইতে জনৈক কয়েদী বলিয়া উঠিল—"অরে বাবা, ঘবরাতে ক্যোঁ ! দো-চার রোজকে বাদ সব ঠিক হো যায়গা।"

সতীন্দ্রনাথ রহিলেন নিরুত্তর।

পুনরায় সেই কয়েদী বলিয়া উঠিল—'দেখো ভইয়া, ইস্ জগহি বহুৎ বুরা হ্যায়। কোই কুছ সুননেওয়ালা হ্যায় নহী—কাঁহে জাদা তকলীফ ভোগেগা। বহারমে হস সাধু যে, অব দেখো কিতনা পরেসানী মিলতা হ্যায়।"

অবাক বিস্ময়ে ঘানির কয়েদীদল সতীন্দ্রনাথকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

খট্‌খট্ করিতে করিতে উপস্থিত হইল সিপাহী-জমাদার। উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—'ইয় ক্যা হল্লা হ্যায়'? কয়েদী-মেট সতীন্দ্রনাথকে দেখাইয়া বলিল—"ইয় শলা কাম নহী করনে মাঙ্গতা হ্যায়"। সতীন্দ্রনাথের পার্শ্বে আসিয়া জমাদার বলিল—"তেরা ক্যা বাত হ্যায়"। গম্ভীরকণ্ঠে সতীন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন—তুমহারা সাহবকা বোলো—ইস্ কম হম নহী করেঙ্গে।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে জমাদার বলিল—"ক্যা, ইতনা বড়ী বাত! লগাও শালেকো ঘানিকে সাথ জোরসে।" ইহা বলিয়াই জমাদার তাহার সঙ্গী অপর সিপাহী ও কয়েদী মেটসহ একত্রে সতীন্দ্রনাথকে জোরপূর্ব্বক ঘানির সহিত ঠেলিতে সুরু করিল। নির্লিপ্ত সতীন্দ্রনাথ তাহাদের সমবেত ধাক্কার সহিত যতটা সম্ভব ঘানির সহিত পাক খাইয়া পরে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সিপাহী-জমাদার অভিজ্ঞ সিপাহী। কাজেই সতীন্দ্রনাথের ব্যবহারের মধ্যে একটা রহস্যের সন্ধান পাইল। সুতরাং তাহাকে আর না ঘাঁটাইয়া উপরওয়ালার নির্দ্দেশ গ্রহণের জন্য

চলিল। মুখে কোন দুর্ব্বলতা না দেখাইয়া বলিল—"অব রহনে দো, অভি হম আতা হ্যায়, দেখেগা ক্যায়সা কাম নহী করেগা।" এই বলিয়া গুম হইয়া জমাদার চলিয়া গেল।

* * * *

১১০ ধারায় সদলবলে গ্রেপ্তার

দিল্লী হইতে বিশেষভাবে প্রেরিত হইয়া জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে আসিলেন মিঃ ডোনোভন মিঃ ব্লাণ্ডীর পরিবর্ত্তে। তিনি ছিলেন চতুর ও কঠোর প্রকৃতির। তিনি আসিয়াই সতীন্দ্র-নাথের কার্য্যাবলীর প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিলেন—'These are nothing but political of gymnastics'—এসব হইল রাজনৈতিক প্রস্তুতির কার্য্য। সুতরাং কোন দৃষ্টিভঙ্গী দ্বারা এখন সরকারী কার্য্যাবলী হইবে পরিচালিত উহা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইল।

মিঃ ডোনোভন ঠিক করিলেন যে সতীন্দ্রনাথের এই সুদূর-প্রসারী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করিতে হইবে। সুতরাং নানা প্রকারের সূত্র সন্ধানে তিনি রহিলেন ব্যস্ত।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে শাস্তিমূলক পাইকারী কর (Punitive Tax) হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যেভাবে সাধ্যের বহু অতিরিক্ত হিসাবে ধার্য্যকৃত হইয়া কঠোরভাবে আদায় চলিতেছিল উহাতে হিন্দু সমাজের এক শ্রেণীর মনে বিশেষ আতঙ্ক সৃষ্টি করিল। এই আতঙ্কিত মনোভাবকে বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত মিঃ ডোনোভন তাঁহার কূটনীতির মধ্যে গ্রহণ

করিলেন। হিন্দুদের এক শ্রেণীকে হাত করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রস্তাব করিলেন 'Peace Committee'—শান্তি সমিতি গঠন করিবার জন্য এবং অজ্ঞাতভাবে ইঙ্গিত রহিল যে শান্তি সমিতির সভ্যদের দেয় টেক্স মকুব করা হইবে। ইহার ফলে স্বভাবতই দুর্ব্বল প্রকৃতির কতক লোক এই প্রস্তাবে আকৃষ্ট হইল।

মিঃ ডোনোভনের ষড়যন্ত্র যখন বেশ পাকিয়া উঠিল তখন তাহার বজ্রমুষ্টি হইল নিক্ষিপ্ত! সরকারী এবং বেসরকারী বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত কতিপয় দুর্ব্বল ও স্বার্থপর হিন্দু-দের যোগ-সাচকে পেনাল কোডের ১১০ ধারার একটী বিশেষ অংশের বিধানমতে সদলবলসহ সতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া আটক রাখিবার ব্যাপক ব্যবস্থা প্রস্তুত হইল। সুতরাং অতর্কিতে ১৯২৮ সনের ২০শে মার্চ্চ তারিখে ঝড়ের ন্যায় সতীন্দ্রনাথের অসংখ্য সহকর্ম্মীদের মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া কতিপয় তরুণ কর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করা হইল উক্ত ১১০ ধারার বিধান মতে। এই প্রকারের গ্রেপ্তারের মূল উদ্দেশ্য রহিল তাঁহার কর্ম্মীসংস্থার বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করা—যাহার ফলে সতীন্দ্র-নাথের আরব্ধ কর্ম্ম ব্যাহত বা স্তব্ধ হইতে পারে।

এই ১১০ ধারায় গ্রেপ্তারের আবর্ত্তে যাঁহারা পড়িয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন—হীরালাল দাশগুপ্ত, দেবেন দত্ত, আশু মুখার্জ্জী, কৃষ্ণ চাটার্জ্জী, ফণী চাটার্জ্জী, ৺শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্য, ৺রবি রায়, বিনোদ কাঞ্জিলাল, দীনেশ সেন, সুরেন গাঙ্গুলী, রেবতী গাঙ্গুলী, ধীনতাক্ প্রভৃতি সতীন্দ্রনাথের কতিপয় সহকর্ম্মীগণ।

এই গ্রেপ্তারের অনতিবিলম্বেই আরম্ভ হইল পুলিশের ব্যাপক জুলুম অত্যাচার পটুয়াখালী সহরের উপরে। সত্যাগ্রহ অফিসের যাবতীয় দ্রব্যাদি জোর পূর্ব্বক বে-আইনীভাবে অপসারণ করিয়া গৃহের দরজার উপর তালা লাগান হইল। সহরের বিভিন্ন হোটেল, দোকান এবং স্থানীয় লোকদের হুঁসিয়ার করিয়া দেওয়া হইল যেন কেহ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবেও কোন সত্যাগ্রহীকে স্থান বা আহার্য্য দান না করে। ষ্টীমার বা নৌকাযোগে আগত ব্যক্তিদের যাতায়াত লক্ষ্য রাখিয়া সন্দেহভাজন সত্যাগ্রহী অনুমানে বহুলোককে থানায় আনিয়া বিবিধভাবে অত্যাচার করা হইল। সন্দেহের অবকাশে যে কোন ব্যক্তি, হোটেল-ওয়ালা বা দোকানীকে থানায় আনিয়া নানারূপ হয়রাণি ও ভীতি প্রদর্শন করা হইল। স্থানীয় প্রবীণ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গৃহে সদা সতর্ক পাহারা দেওয়া চলিত। ইহারই অবসরে বাহির হইতে আগত ২।৪ জন কর্ম্মী যখন সত্যাগ্রহ করিবার জন্য অগ্রসর হইল তখন তাহাদের গ্রেপ্তার না করিয়া উত্তমরূপে প্রহার দিয়া সহর পরিত্যাগে বাধ্য করা হইত। ক্ষুদ্র সহর পটুয়াখালীতে তখন স্থাপিত ছিল এক বিরাট সশস্ত্র পিটুনী পুলিশ বাহিনী। আইন-আদালতের বিধি-বিধান বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার এক চরম অবস্থা এখানে প্রকাশ পাইল।

উক্ত বিবিধ বে-আইনী অত্যাচারের ফলে এবং পটুয়াখালীর ভৌগোলিক অবস্থার দরুণ বাহিরে বিশেষতঃ কলিকাতার বিভিন্ন

খবরের কাগজে এইসব কাহিনী প্রচারিত হইতে বিশেষ বাধা-প্রাপ্ত হইল। সুতরাং প্রথম কতিপয় মাস বাহিরের জনসাধারণের অজ্ঞাতসারেই চলিল এই প্রকারের নির্য্যাতন।

* * * *

প্রেসিডেন্সী জেলে অনশন

সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত সতীন্দ্রনাথ কঠোরতম শ্রম হিসাবে ঘানির কার্য্যের প্রতিবাদে অনশন সুরু করেন। এই অনশনের মধ্যেই বরিশাল হইতে প্রেরিত ১১০ ধারার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা সতীন্দ্রনাথের প্রতি অর্পিত হয়।

১১০ ধারা মতে বিচারের জন্য আসিলেন বরিশালের সহকারী জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বি, আর, সেন, (আই, সি, এস)—বর্ত্তমানে ভারত সরকারের পদস্থ কর্ম্মচারী। সুতরাং আদালতে হাজিরা দিবার জন্য সতীন্দ্রনাথকে আনয়ন করা হইল উক্ত প্রেসিডেন্সী জেল হইতে।

জেল পোষাক পরিহিত, ১৮ দিবসের অনশনের ফলে রুক্ষ ও শুষ্ক সতীন্দ্রনাথের হস্ত পদ শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় আনয়ন করা হইল সুদূর কলিকাতা হইতে পটুয়াখালী সাব-জেলে। সমাজের নিকৃষ্ট দস্যু-তস্করকে যে ভাবে জনসমক্ষে হেয় ও ঘৃণ্যভাবে প্রকাশিত করা হয়, সতীন্দ্রনাথের প্রতি হইল অনুরূপ ব্যবহার। কর্ত্তৃপক্ষ হয়তো ভরসা করিয়াছিলেন যে এই ব্যবহারের ফলে বরিশালের জনচিত্তে বিশেষ ভয়ের সৃষ্টি করিবে। যে সরকারের বিচারক কর্ত্তৃক সতীন্দ্রনাথের magnetic personality ও

Sterling mroality-র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইল—তাহারই প্রতি আবার এরূপ ব্যবহার! সম্মান-অসম্মানে ভ্রূক্ষেপহীন সতীন্দ্র-নাথ দৃপ্ত ভঙ্গীতে দৃঢ় পদক্ষেপে প্রবেশ করিলেন পটুয়াখালীর সাব জেলে।

সরকারী প্রেরণায় পুলিশী অত্যাচারের দাপটে পটুয়াখালীর সত্যাগ্রহ দৈনন্দিন যে ভাবে চলিতেছিল, উহা স্থগিত হইয়া গেল। জনসাধারণের মনোবলের উপর পড়িল এক প্রচণ্ড আঘাত। সুতরাং নৈরাশ্যের এই অনিশ্চিত পরিবেশে সতীন্দ্র নাথের কি কিছুই করণীয় নাই?—এই আত্মজিজ্ঞাসায় তাঁহার অন্তরকে সতত ব্যথিত করিতেছিল। প্রেসিডেন্সী জেলে আরব্ধ অনশন পরিত্যাগ না করিয়া আপন আত্মশুদ্ধির অনুসন্ধানে ক্রমাগত অনশন করিয়াই চলিলেন। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে সত্যের আলোক একবার উদ্‌ভাসিত হইলে চতুর্দিকস্থ অবসাদ ও নৈরাশ্যের কুয়াশা কাটিতে বিলম্ব হয় না। এরূপ আত্মশুদ্ধির অনশন চলিয়াছিল প্রায় ৫৭ দিবসব্যাপী।

এদিকে ১০৭ ধারার দণ্ডের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা হয় এবং আপীলের স্থনানী সাপেক্ষ তাঁহার জামীনেমুক্তির আদেশ দেওয়া হয়। এই জামীনের মুক্তির আদেশ হইলে কি হইবে তাহাকে তো পুনরায় আটক রাখা হইয়াছে ১১০ ধারার মামলার জন্য।

সুতরাং মিঃ বি, আর, সেনের আদালতে তাহাদের ১১০ ধারার বিচার সময়ে—সতীন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার অবৈধভাবে হইয়াছে—এই মর্মে পুনরায় হাইকোর্টে মোসন উত্থাপন করেন

জে, এম, সেনগুপ্ত। এই মোসন শুনানীর সময় সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক আনুপূর্ব্বিক সরকারী বিবিধ অবৈধ অনাচারের কথা উল্লেখ করেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নানাবিধ অবৈধ অনাচারের অকাট্য প্রমাণ দৃষ্টে মাননীয় বিচারপতি সি, সি, ঘোষ ন্যায় বিচারক রূপে ক্রুদ্ধ হইয়া গর্জ্জিয়া বলিলেন—'So long this High court exists, it will not tolerate any zulum by any body upon any body.' ফলে বিচারকের আদেশে সতীন্দ্র নাথকে মুক্তির আদেশ দেওয়া হয়।

বিচারপতি জাষ্টিস ঘোষ কর্ত্তৃক এই প্রকারের মন্তব্যের দরুণ সমগ্র দেশে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে স্থানীয় সরকারী কর্তৃপক্ষের যাবতীয় কর্ম্মপ্রণালীর উপর পতিত হইল এক রূঢ় আঘাত।

প্রাদেশিক সরকারি সচকিত হইল এবম্প্রকার কার্য্যাবলী দৃষ্টে। নির্দ্দেশ পাঠান হইল বরিশাল সদরে যে প্রকারেই হউক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পরিসমাপ্তি করিতে হইবে।

সুচতুর মিঃ ডোনোভন স্থির করিলেন সত্যাগ্রহের দাবীর অনুকূলেই সত্যাগ্রহ মীমাংসা করিতে হইবে। জনৈক সরকারপক্ষীয় বে-সরকারী নেতা মিঃ ডোনোভনকে প্রশ্ন করিলেন যে যদি অপর পক্ষ অস্বীকৃত হয় তবে এরূপ মীমাংসায় কি প্রতিকার হইবে। বিনা দ্বিধায় উত্তর আসিল—'Then I shall put my boot on the othor leg'—'আমার পায়ের বুট অপর পায়ে লাগাব'!

১৯২৮ সনের ৭ই জুলাই বরিশালের জেলা বোর্ড অফিসের

প্রশস্ত হল-গৃহে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের মিলিত সভায় সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে মীমাংসাপত্র স্বীকৃত ও গৃহীত হইল। উক্ত মীমাংসার প্রধানতম বিষয় ছিল—যে, সর্ব্বসাধারণের জন্য সর্ব্বসময়ে সরকারী সড়ক থাকিবে উন্মুক্ত—উহার কোন প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করা চলিবে না। সত্যাগ্রহের মূল দাবী পূর্ণ মাত্রায় গৃহীত হইল সুতরাং সত্যাগ্রহ আন্দোলনও উঠাইয়া লওয়া হইল। যখন মীমাংসাপত্র সম্পূর্ণ ভাবে গৃহীত হইল তখন সরকার পক্ষের আনীত যাবতীয় মামলা,—বিশেষভাবে উক্ত ১১০ ধারার মামলাও প্রত্যাহৃত হইল। উক্ত মীমাংসা-পত্রে স্বীকৃতির দলিলরূপে হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ সহ সরকারী প্রতিনিধিগণও তাঁহাদের স্বাক্ষর যুক্ত করেন। পটুয়াখালী সত্যাগ্রহের জয় স্বীকৃত হইল প্রায় দীর্ঘ দুই বৎসরের লাঞ্ছনা ভোগের পর।

* * * *

সিটি কলেজ বিরোধ

কলিকাতা সিটি কলেজের ছাত্রদের হোষ্টেলে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্য লইয়া কলেজের ব্রাহ্ম কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রদের চলিতে ছিল দারুণ বিরোধ। বিরোধের তীব্রতা ছাত্রসমাজ হইতে হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তারিত হইল। ইহার ফলে সুরু হইয়া গেল সিটি কলেজ বর্জ্জন আন্দোলন। বাংলার তরুণ নেতা সুভাষচন্দ্র ছাত্রদের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। যে জটীল পরিস্থিতির উদ্ভব হইল উহার সমাধানের পন্থার সন্ধান পাওয়া গেল না।

এমন সময় পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ-বিজয়ী সতীন্দ্রনাথ আসিয়া-

ছেন কলিকাতায় তাহার নিজ কার্য্য উপলক্ষে। বাংলাদেশে, তথা সমগ্র ভারতবর্ষে নির্ভীক কর্মীনেতা রূপে সতীন্দ্রনাথের নাম তখন সর্ব্বত্র সুপরিচিত ছিল। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে সিটি কলেজের ছাত্রগণ আসিল সতীন্দ্রনাথের সাহায্য পাইবার আশায়।

সতীন্দ্রনাথ দেখিলেন যে এই বিরোধের একমাত্র পথ হইল সম্মানজনক মীমাংসা। নচেৎ এই বিরোধের দরুণ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবার এক নূতন বিভেদের সৃষ্টি হইবে যাহা সামগ্রিকভাবে দেশের পক্ষে হইবে অকল্যাণজনক। আবার তরুণ ছাত্রদের প্রতি তাঁহার রহিয়াছে গভীর ভরসা, কোন কারণে পরাজিতের মনোভাব যাহাতে তাহাদের স্পর্শ না করে—সেজন্য তাঁহার ছিল সতর্ক দৃষ্টি। সুতরাং সম্মানজনক মীমাংসায় যদি ছাত্রগণ স্বীকৃত থাকেন তবে তিনি তাহাদের পক্ষ লইয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত রহিবেন। ছাত্রগণ স্বীকৃত হইলেন।

শীঘ্র তিনি সুভাষচন্দ্র বসু ও ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের সহিত পরামর্শ করিয়া সিটি কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। প্রারম্ভিক আলোচনা উৎসাহজনক বোধ হইল না, যেহেতু ছাত্র আন্দোলন ছিল তখন বিশেষভাবে নিস্তেজ ও চাঞ্চল্যবিহীন।

ঘটনার নাটকীয় পরিস্থিতি উদ্ভাবনে সতীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষভাবে অভিজ্ঞ। সুতরাং অবিলম্বে সেইরকম একটী পরিবেশ—'Situation' সৃষ্টির আবশ্যক মনে করিলেন যাহার ফলে কলেজ কর্ত্তৃপক্ষের অনমনীয়ভাব শিথিল করিবে এবং সম্মানজনক মীমাংসা হইবে সহজতর।

সিটি কলেজের নিকটস্থ স্থানের উপর জনসমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে পুলিশের পক্ষ হইতে। অবস্থা দৃষ্টে ছাত্রদের তিনি উপদেশ দিলেন উক্ত আদেশ অমান্য করিবার জন্য এবং আবশ্যক হইলে তিনিও উহা অমান্য করিবেন। তবে উহার পূর্ব্বে তিনি একবার উক্ত নিষিদ্ধস্থান পরিদর্শন করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

তরিৎ গতিতে ছাত্র আন্দোলনের মোর ঘুরিয়া গেল। বিপুল উৎসাহ উদ্যমে শত সহস্র ছাত্রও সমবেত হইতে থাকিল উক্ত নিষিদ্ধ এলাকার পার্শ্বে। সতীন সেন যখন আসিতেছেন তখন নিশ্চয়ই কোন একটা না একটা ঘটনা সংঘটিত হইবেই।

পুলিশবাহিনী প্রমাদ গণিলেন। সতীন সেনের কথা ও কার্য্যের মধ্যে যে কোন প্রভেদ নাই ইহা জানা কথা। সুতরাং এক বিরাট পুলিশবাহিনীর সমাবেশ হইল ঐ নিষিদ্ধ এলাকায়।

অপরাহ্ণ প্রায় ৫ ঘটিকার সময় সতীন্দ্রনাথ আসিলেন ঘটনা স্থলে। সমবেত বিরাট ছাত্রজনতা বিপুল উৎসাহে উল্লসিত হইয়া উঠিল। ব্যক্তিত্বপূর্ণ, দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ সতীন্দ্রনাথ দৃঢ় পদক্ষেপে সমুদয় নিষিদ্ধ এলাকার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত অতিক্রম করিলেন এবং পুনরায় উক্ত পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পুলিশ রহিল নির্বাক, নিশ্চল। অতঃপর ছাত্রজনতার মুহুর্মুহু উল্লাসধ্বনির মধ্যে সতীন্দ্রনাথ স্থান পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বুঝিয়া গেলেন কার্য্য-ক্ষেত্র প্রস্তুত।

সতীন্দ্রনাথের স্থান পরিত্যাগের পর হইতে ছাত্র তরুণ দল

সুরু করিল নিষিদ্ধ আইন অমান্য করিতে। সক্রিয় পুলিশ-বাহিনী দিল বাধা। বাধা অগ্রাহ্য করিয়া ছাত্ররা অগ্রসর হইল। দেখিতে দেখিতে দলেদলে ছাত্রগণ গ্রেপ্তার বরণ করিল। সমগ্র নগরীতে চকিতে সংবাদ রটিয়া গেল এই নাটকীয় পরিস্থিতির দ্বারা।

উক্ত দিবস রাত্রে ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের বেঙ্গল ইম্যুইনিটী অফিসে মীমাংসার জন্য আলোচনা সভা বসিল। সুভাষচন্দ্র বসু, নরেন্দ্রনাথ দত্ত সহ সতীন্দ্রনাথ উভয়পক্ষের প্রতি-নিধিগণের সহিত আলোচনা করিলেন। সতীন্দ্রনাথের সিটি কলেজের নিষিদ্ধস্থান পরিদর্শনের ফলে উদ্ভূত ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মীমাংসার পথ সরল হইল। অবশেষে উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য এক সম্মানজনক প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা দীর্ঘ দিবসের বিরোধের অবসান ঘোষণা করা হয়।

* * * *

বরিশাল প্রদর্শনী ও পুলিসী জুলুম ঃ

বরিশাল সরকারী উদ্যোগে ১৯২৯ সনের ২৩শে জানুয়ারী অনুষ্ঠিত হইল একটী কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী। উক্ত প্রদর্শনীকে অতিরিক্তভাবে আকর্ষণীয় করিবার উদ্দেশ্যে নাটকাভিনয় করিবার জন্য কলিকাতা হইতে আনা হয় থিয়েটারদল এবং তৎসহ কয়েক-জন নটীও আসে। বরিশাল সহরে দীর্ঘকাল যাবৎ নৈতিক নিষ্ঠাচারের আদর্শ প্রচলিত ছিল। সুতরাং প্রদর্শনীর মধ্যে নটীর উপস্থিতি ও অভিনয় নৈতিক আদর্শের সহায়ক নয় বলিয়া ছাত্র

যুবকগণ বিবেচনা করিলেন। কর্তৃপক্ষের নিকট আপত্তি জানান হইল—এই অভিনয়ানুষ্ঠান বন্ধ রাখিবার জন্য। কিন্তু কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করিলেন না। অবশেষে ছাত্র-যুবকগণ নিজেদের মধ্যে সভা করিয়া প্রতিবাদ স্বরূপ প্রদর্শনী বর্জন করিবার জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদন প্রচার করেন। এই আবেদনকে কার্য্যকরী করিবার জন্য প্রদর্শনীর সম্মুখ ভাগে প্রবেশ-দ্বারে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং সুরু করেন।

বরিশালে তখন পুলিশের অধিকর্তা ছিলেন মিঃ কোলসন,—পরে তিনি কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হইয়াছিলেন। তিনি ছাত্রদের স্পর্দ্ধা বরদাস্ত করিতে পারিলেন না। ঢালাও হুকুম দিলেন পুলিশকে—লাঠির আঘাতে ছাত্র-পিকেটিংকারীদের বাধা দিবার জন্য। হিংস্র কুকুরের ন্যায় পুলিশবাহিনী লাঠির নিষ্ঠুর আঘাতে ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। সমগ্র বরিশালে আবার প্রবল আলোড়ন সুরু হইল।

বঙ্গীয় স্বরাজ পার্টির নেতা, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি ও কলিকাতার মেয়র জে, এম, সেনগুপ্ত তখন ছিলেন বরিশালে আইন ব্যবসায় উপলক্ষে। তাঁহারই জ্ঞাতসারে সংঘটিত এই বর্বরোচিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ সেনগুপ্ত কঠোর ভাষায় জনসভায় প্রতিবাদ জানাইলেন।

বরিশালের জননেতা সতীন্দ্রনাথের সাময়িক অনুপস্থিতি এই সময় গভীরভাবে অনুভূত হইল। কারণ এরূপ পরিস্থিতির উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন একমাত্র তিনিই করিতে পারেন—সকলেরই

ছিল এইরূপ বিশ্বাস। সতীন্দ্রনাথকে কলিকাতায় সংবাদ পাঠান হইল—অবিলম্বে বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য।

ছাত্র-যুবকগণ কর্ত্তৃক অকস্মাৎ প্রদর্শনী-বর্জ্জন-আন্দোলন সুরু করা বিষয়ে সতীন্দ্রনাথের সহিত বা বরিশালের প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সহিত পূর্ব্বাহ্ণে কোন প্রকার পরামর্শ না করিয়া উৎসাহের আবেগে ছাত্রদল এমন এক কার্য্য সুরু করিয়া বসিয়াছিল, যাহার সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিষয়ে তাহাদের ছিল না কোন সম্যক জ্ঞান। সুতরাং এক বাস্তব জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র ছিল না।

তরুণ সম্প্রদায়ের মানসিক শক্তির বিকাশের প্রতি সতীন্দ্রনাথ ছিলেন গভীর ভাবে আগ্রহশীল। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, প্রত্যেকের মধ্যে অসাধারণ শক্তির সম্ভাবনা রহিয়াছে—প্রয়োজন উহার বিকাশের সুযোগ দেওয়া। ছাত্রদের এই কার্য্যের মধ্যে তিনি দেখিলেন তাঁহাদের নৈতিক আত্মশক্তির পরিচয়। সুতরাং তাহাদের এই বিপজ্জনক কার্য্যের মধ্যে ভুল বা ভ্রান্তি থাকিতে পারে বা বিচার বিবেচনার অভাব হইতে পারে, কিন্তু উহাকে বড় করিয়া না দেখিয়া তিনি তরুণ সম্প্রদায়ের আপন বিবেচিত আদর্শ অনুযায়ী বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিবার প্রবৃত্তিকে সম্বর্দ্ধনা না করিয়া পারিলেন না। তিনি জানিতেন যে, পুলিশের লাঠির ভয়ে ভীত পরাজিত তরুণগণ ভবিষ্যতে কখনও স্বাধীনতা সংগ্রামে অগ্রণী হইতে পারে না।

১৯২৯ সনের ২৯শে জানুয়ারী সতীন্দ্রনাথ বরিশালে প্রত্যাবর্ত্তন

করিলেন। পৌঁছিয়াই তিনি বলিলেন যে, আলাপ-আলোচনার পরিবর্ত্তে লাঠিবাজী দ্বারা ইহার মীমাংসা চলিবে না। তিনি দাবী করিলেন যে, অবিলম্বে এই পুলিস জুলুম বন্ধ করিতে হইবে। উহা না করা হইলে তিনি ঘোষণা করিলেন যে পুলিসের আঘাতে জনসাধারণের রক্তের ধারা যদি বরিশালের রাস্তা রঞ্জিতও হয় তবু এই পাশবিক শক্তির নিকট মস্তক নত করা হইবে না।

সতীন্দ্রনাথের এই দৃঢ় সঙ্কল্প জনসাধারণকে বিদ্যুৎবৎ চমকিত ও বিস্মিত করিল। একবার যখন তিনি মনস্থির করিয়াছেন, শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাহা করিবেনই—ইহাই স্বতঃসিদ্ধ।

মিঃ কোলসনের ন্যায় কঠোর ও মেজাজী অফিসারের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। ক্রুদ্ধভাবে মিঃ কোলসন উক্তি করিলেন যে সর্ব্বশক্তি দ্বারা এবং প্রয়োজন হইলে গুলীবর্ষণ দ্বারা আদেশ অমান্য প্রতিহত করা হইবে। সুতরাং অভাবনীয় এক নাটকীয় পরিস্থিতির জন্য উদ্বিগ্ন চিত্তে সকলেই অপেক্ষা করিতে থাকিলেন।

* * * *

১০৭ ধারায় পুনরায় গ্রেপ্তার

সতীন্দ্রনাথের আহ্বানে শহরের গণ্য-মান্য প্রবীণ নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে শত-সহস্র তরুণ যুবক উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত সমবেত হইলেন বরিশালের রাজাবাহাদুরের হাবেলী-প্রাঙ্গণে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে যাত্রা করিবেন পুলিস-বেষ্টনীর অভিমুখে। আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান, গম্ভীর সতীন্দ্রনাথ দৃঢ়চিত্তে অপেক্ষমান এমন

সময়ে স্থানীয় সহকারী পুলীস সুপার আসিয়া ১০৭ ধারা মতে সতীন্দ্রনাথকে তাঁহার গ্রেপ্তারের পরোয়ানা দেখাইলেন। নাটকীয় চরম পরিণতির মুহূর্ত্তে, সম্ভাব্য সংঘর্ষের পরিবর্ত্তে সতীন্দ্রনাথের গ্রেপ্তার এক বিহ্বলজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিল।

এই গ্রেপ্তারের পশ্চাতে সরকারী মহলে তীব্র কর্ম্মতৎপরতা চলিতেছিল। সরকারী পক্ষভুক্ত স্থানীয় কতিপয় জননেতার সাবধান-বাণী শেষ পর্য্যন্ত জেলা কর্ত্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলেন—একদিকে সতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া এবং অপর দিকে সমুদয় পুলীস বাহিনীকে প্রদর্শনী প্রাঙ্গণ হইতে উঠাইয়া লইয়া। কাজেই সতীন্দ্রনাথের দাবী হইল স্বীকৃত তাঁহার গ্রেপ্তারের মাধ্যমে। অবশ্য মামলা প্রত্যাহৃত হইবার ফলে তিনি মুক্ত হইলেন কয়েক দিন পর।

* * * *

দারোগা হত্যা

১৯২৯ সনের প্রারম্ভেই কলিকাতায় সাইমন কমিশনের আগমন হয়। বিরাট ও বিপুল উদ্দীপনার সহিত কলিকাতার লক্ষ লক্ষ নরনারী বিক্ষোভ প্রদর্শনে উপস্থিত ছিলেন। ইতিমধ্যেই ভারতে সর্ব্বত্রই এই কমিশনের বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। লাহোরে পুলীস কর্ত্তৃক দেশ-বরেণ্য লালা লাজপত রায়ের বুকের উপর লাঠিপেটার সংবাদ এবং তৎপরে তাঁহার মৃত্যু—সমগ্র ভারতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষে অভিপ্সিত স্বাধীনতা লাভ সুদূর পরাহত বলিয়া প্রতিয়মান হইল। সংগ্রাম ও

লাঞ্ছনা ব্যতীত দেশের মুক্তি নাই, কাজেই গান্ধীজীর নেতৃত্বে বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত হইতেছিল। সমগ্র দেশে তখন চলিতেছিল গভীর রাজনৈতিক চাঞ্চল্য।

এদিকে বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানেই রাজনৈতিক কর্ম্মধারা দুইটী পথে প্রবাহিত হইতেছিল। গান্ধীজীর প্রবর্ত্তিত অহিংস পন্থাকে নীতি (creed) হিসাবে গ্রহণ না করিয়া কৌশল (policy) হিসাবে কংগ্রেস কর্ত্তৃক পূর্ব্ব হইতেই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং দেশের বহুলাংশের নিকট এই পন্থা বিশেষ ভাবে কার্যকরী ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করে। আবার অপর দিকে বাংলার বিপ্লবী তরুণ সম্প্রদায় অহিংসার সর্ব্বব্যাপী প্রয়োগ ক্ষমতার উপর ততটা আস্থাশীল না থাকিয়া, কংগ্রেসের জাতীয় সংগ্রামের সাথে সাথে বিপ্লবানুষ্ঠানের কার্য্যে ছিল লিপ্ত।

জীবনের প্রথম হইতেই সতীন্দ্রনাথ ছিলেন বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মধ্যে জনসাধারণকে সঙ্ঘবদ্ধ ও শক্তিশালী করিতে অহিংসার পন্থা (Non-violent policy) ব্যাপক ভাবে ফলপ্রসূ হইতে তিনি দেখিয়াছেন। কিন্তু হিংস-নীতির প্রয়োগ সেইরূপ ক্ষেত্রে অতীব সীমাবদ্ধ বলিয়া তাঁহার নিকট প্রতীয়মান হইয়াছে। সুতরাং ক্রমশঃই তিনি গান্ধীর অহিংসাকে নীতি হিসাবে গ্রহণ না করিয়াও শুধুমাত্র কৌশল হিসাবে গ্রহণ করিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ করিতেছিলেন।

কিন্তু তাঁহার তরুণ সহকর্ম্মীগণের অধিকাংশই গণ-আন্দোলনের সাথে সাথে প্রয়োজন বোধে হিংসাত্মক পথানুসরণে ছিল

বিশেষ বিশ্বাসী ও উৎসাহী। বাংলাদেশের অপরাংশের অন্যান্য বিপ্লবীদের ন্যায় তাহারাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বৃটিশ সরকারের অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদে স্থান বিশেষে হিংস কার্য্য প্রয়োগ সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিত। সমগ্র দেশের তরুণ সম্প্রদায় তখন যে ভাবে ভাবুক ছিল, সতীন্দ্রনাথের উক্ত সহকর্মীগণও সেই ভাবে ভাবুক ছিল।

সুতরাং এই মানসিক পরিবেশে বরিশালের প্রদর্শনী বর্জ্জন উপলক্ষে মিঃ কোলসনের নির্দ্দেশে যে নিষ্ঠুর ও নির্ব্বিচার লাঠি বর্ষণ হয়, উহারই প্রতিশোধের মনোভাব উক্ত তরুণদের মনে জাগ্রত হইল। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা উপলক্ষে আত্মরক্ষার্থে বহু-পরিমাণে দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র জেলার সর্ব্বত্রই সংগৃহীত ছিল। কাজেই সতীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে উহা দ্বারাই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কয়েকটী তরুণ উদ্যোগী হইতেছিল। কারণ তাহাদের ধারণা সতীন্দ্রনাথ যেন ক্রমশঃ অহিংসপন্থী হইয়া উঠিতেছেন। সুতরাং তাঁহাকে উহা জ্ঞাত করাইলে তাহাদের এই অপরিণাম-দর্শী, অপরিপক্ক ও ভ্রান্ত ক্রিয়াকার্য্য বাধা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনাই ছিল।

১৯২৯ সনের মার্চ্চ মাসের এক সন্ধ্যায় অপসারিত দিবালোকে বরিশালের জনবহুল কালীবাড়ী রোডের উপর দিয়া সাইকেলে করিয়া যাইতেছিলেন কোতোয়ালীর দারোগা যতীশরায়। সহসা একটী বালক আসিয়া তাঁহার সাইকেলের হ্যাণ্ডল ধরিল এবং সাইকেলের গতি রুদ্ধ হইতে না হইতেই

চকিতে তীক্ষ্ণ ছুরির ফলাকা বিশাল দেহধারী যতীশবাবুর বক্ষে প্রবিষ্ট হইল। সেই বলশালী ও দীর্ঘ-দেহ যতীশবাবু মৃত্যু-যাতনায় চিৎকার করিয়া সাইকেল হইতে ছিটকাইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন এবং অনতিবিলম্বেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় পথচারীরদল স্বাভাবিক প্রেরণা বলে চীৎকার করিয়া উঠিল 'চোর', 'চোর'!

এদিকে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারের মধ্যে অদূরবর্ত্তী একটি জলাশয়ের মধ্যে জনৈক সন্তরণশীল বালকের সন্ধান পাইয়া পথচারীর দল তাহাকেই ধরিল এবং পুলিশ আসিয়া বালককে গ্রেপ্তার করিল। বালকের বয়স ছিল তখন ১৪ বৎসর, নাম শ্রীরমেশ চক্রবর্ত্তী। একটী ক্ষীণকায় ক্ষুদ্র বালকের পক্ষে কি প্রকারে সেই দীর্ঘ ও বলবান যতীশবাবুকে সাইকেলারূঢ় অবস্থায় ছুরিকাঘাতে হত করা সম্ভবপর হইল তাহা অতীব বিস্ময়ের বিষয় হইয়াই রহিল!

এই হত্যাকাণ্ড যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘটিত হইয়াছে ইহা পুলিশের নিকট সুস্পষ্ট বলিয়া গৃহীত হইল আর তথাকথিত আততায়ী বালক রমেশকে সনাক্ত করা হইল সতীন্দ্রনাথেরই একজন তরুণ অনুগামীরূপে। সুতরাং এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধার্থে ক্রুদ্ধ পুলিশবাহিনী নিষ্ঠুরভাবে উদ্যোগী হইল। সে উদ্যোগে বরিশালের জনসাধারণ বিশেষভাবে ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল।

যখন এই ঘটনা সংঘটিত হয় সতীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন পটুয়া-

থালী সহরে। পর দিবস সংবাদ পৌঁছিবামাত্র তিনি অনুমান করিলেন যে সরকারপক্ষ এই ঘটনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া বরিশালের রাজনৈতিক কর্ম্মপ্রচেষ্টার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিবে। শুধু তাহাই নয় জনসাধারণের উপরও অত্যাচারের মাত্রা এবার কঠোরতর হইবে। সুতরাং জনসাধারণের মনে সাহস ও আত্মপ্রত্যয় আনিবার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে তিনি বরিশাল আসিলেন।

বরিশালে উপস্থিত হইয়াই সতীন্দ্রনাথ তাঁহার স্বাভাবিক বলদৃপ্ত ভঙ্গীতে সহরের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে জনসাধারণ কতকটা আশ্বস্ত হইল।

সরকারপক্ষ সতীন্দ্রনাথের উপস্থিতি সহ্য করিলেন না। তাঁহাদের সর্ব্ব পরিকল্পনা ব্যর্থ হইবে যদি সতীন্দ্রনাথকে স্বাধীন-ভাবে চলিতে দেওয়া হয়। সুতরাং যে দিবস তিনি বরিশাল পৌঁছিলেন সেই দিবস অপরাহ্নেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

এবার সুরু হইল পুনরায় নির্ব্বাচিত সহকর্ম্মীদের গ্রেপ্তারের পালা। সহরে ও জিলায় বিভিন্ন স্থান হইতে বাছিয়া বাছিয়া তাঁহার সহকর্ম্মীদের গ্রেপ্তার করা হইল। সত্যাগ্রহের আপোষ-মীমাংসার সর্ত্ত হিসাবে যে ১১০ ধারার মামলা প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, সেই চুক্তি ভঙ্গ করিয়া সরকার পুনরায় সেই ১১০ ধারার বিধান মতে তাহাদের গ্রেপ্তার করিলেন।

সতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্ম্মীগণ রহিয়াছেন কারাগারে আবদ্ধ—আর পুলিশের ভয়ে ভীত অবস্থায় রহিয়াছে জনসাধারণ।

কাজেই পুলিশের ইচ্ছামত সাক্ষ্য-প্রমাণসংগ্রহ করা কঠিন হইল না।

এবারও মিঃ বি, সি, চাটার্জ্জী ব্যারিষ্টার আসিলেন রমেশের পক্ষে মামলা পরিচালনা করিবার জন্য। কিন্তু সরকার পক্ষ এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ লইয়াই ছাড়িল। জুরীর বিচারে রমেশের হইল ফাঁসীর হুকুম।

অবশ্য পরে হাইকোর্টের আদেশে হইল যাবজ্জীবন কারাবাসের হুকুম হইয়াছিল।

বালক রমেশ আন্দামানের কঠোর ও দীর্ঘ যাবজ্জীবন কারাবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ করিয়া পরিণত বয়সে মুক্তিলাভ করে।

* * * *

দ্বিতীয় ১১০ ধারার বিচার :

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পটুয়াখালী হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে সরকার পক্ষীয় ও জমিদার শ্রেণীর কতিপয় দুর্ব্বল লোককে সতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবার জন্য নানা প্রকারের প্রলোভন দ্বারা আকৃষ্ট করা হয়। ইহা ব্যতীত পুলিশের প্ররোচনায় বিভিন্ন শ্রেণীর দুষ্ট প্রকৃতির কতিপয় লোকও সাক্ষীরূপে প্রস্তুত হয়।

এই গ্রেপ্তারের অব্যবহিত পরেই জনসাধারণের উপর পুনরায় জুলুম সুরু হইল। যখন তখন যেখানে সেখানে খানাতল্লাসীর নাম করিয়া সতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক সমর্থনকারীদের গৃহ-বাড়ী তচ্‌নচ্‌ করিয়া ক্ষতিগ্রস্থ করা হইতে থাকিল। যখন যাহাকে খুসী থানায় আনয়ন করিয়া ভীতি প্রদর্শন, এমন কি মার-ধর

করা অবাধে চলিতে থাকিল। কোন আইনজীবি যাহাতে সতীন্দ্র-নাথ বা তাহার সহকর্ম্মীদের সহিত জেলে সাক্ষাৎ করিয়া আইন বিষয়ক কোন পরামর্শ দান না করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা ও করা হইল। এমন কি জামিনের দরখাস্তও যাহাতে পেস না হইতে পারে তদ্রূপ ব্যবস্থা হইল। এই সকল অনাচার-অত্যাচারের সংবাদ যাহাতে কলিকাতার সংবাদ পত্রে বিন্দুমাত্রও প্রকাশ না পায় সেই দিকে কর্তৃপক্ষের সতর্ক দৃষ্টি ছিল।

হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দের সহিত সরকারের যুক্ত চুক্তিনামার এক বিশিষ্ট অংশকে নির্লজ্জরূপে ভঙ্গ করা হইল। শুধু ভঙ্গই করা হইল না যাহাতে কোন তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনি জাগ্রত না হইতে পারে সেইজন্য পুলিশের কঠোর দমননীতি জনসাধারণের উপর প্রয়োগ করা হইল। সুতরাং ভীত-সন্ত্রস্ত জনসাধারণকে পুলিশের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা ও তাহাদের মধ্যে সাহস ও আত্মশক্তি উদ্বোধন করিয়া সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার লুপ্তশক্তি আনয়ন করা কি প্রকারে সম্ভব হইবে ইহাই ছিল সতীন্দ্রনাথের একমাত্র চিন্তার বিষয়।

সতীন্দ্রনাথের চরিত্রের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ছিল অতীব প্রবল। যখনই যে কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করিতেন, তখনই সে কার্য্যে তাঁহার স্নায়ুতন্ত্রের পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিযুক্ত করিতেন। ভয় বলিয়া কোন বস্তুকে তিনি জীবনে গ্রাহ্য করেন নাই। বরং ভয়, বিপদ, লাঞ্ছনা যেখানে রহিয়াছে, তাঁহার স্বাভাবিক চারিত্রিক আকর্ষণ থাকিত সেই দিকেই। বিশেষতঃ যেখানে

অন্যায়, অবিচার বা অত্যাচার থাকিত, সেখানেই তিনি আত্ম-নিয়োগ করিতেন উহার প্রতিকারার্থে—নিজের বিপদ আপদ বা লাঞ্ছনার প্রতি আদৌ ভ্রূক্ষেপ না করিয়া।

সুতরাং সর্ব্বজনগ্রাহ্য চুক্তিভঙ্গের এত বড় অপমান তিনি কিছুতেই স্বীকার করিতে পারিলেন না। কারাগারের অভ্যন্তরে দিনের পর দিন তিনি কেবল আত্ম-জিজ্ঞাসায় মগ্ন রহিলেন। অন্তরের সুস্পষ্ট আদেশ তাঁহার বীর-হৃদয়ে জাগ্রত হইল। এই অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদে প্রয়োজন হইলে তাঁহার জীবন বিনিময় করিবেন তথাপি জাতীয় সম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে দিবেন না। তিনি অনশন সুরু করিলেন।

* * * *

১০৮ দিবস অনশন :

জেলের অভ্যন্তরে থাকিয়া তাঁহার বারবার অনশন গ্রহণের ব্যাপার ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচনার বস্তু ছিল। কেন না এই প্রকারে শক্তিক্ষয় না করিয়া উহাকে বাহিরের বৃহত্তর কার্য্যের জন্য সঞ্চিত করাই ছিল অনেকের মতে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন ছিল অন্য প্রকারের। জীবনের প্রতি কার্য্যাবলীকে খণ্ড-বিখণ্ডরূপে না দেখিয়া উহার সম্পূর্ণতাকে এক সূত্রে গ্রথিত করাই ছিল তাঁহার আদর্শ। সুতরাং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চলিবে সর্ব্বত্রই—কি বাহিরে, কি জেলের অভ্যন্তরে। বিশেষতঃ পরাধীন জাতির নিষ্ক্রিয় দুর্ব্বলতাকে দূরীভূত করিবার জন্যই সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন আদর্শ সৃষ্টির। এবং

এই আদর্শ সৃষ্টি হয় সংঘাতের দ্বারা বিপদের মধ্যে। আপন দুর্ব্বলতাকে পূর্ণভাবে পরাভূত করিবার মধ্যেই জাগ্রত হয় এই আদর্শ। তাই সতীন্দ্রনাথের তথাকথিত বেপরোয়া কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে তরুণ সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করিত তাহার প্রধান কারণ ছিল সতীন্দ্রনাথের এই জীবন-দর্শন।

সতীন্দ্রনাথের অনশন সুরু হইল এমন পরিবেশে যখন কারাগারের বাহিরে পুলিশের ব্যবস্থায় বরিশালের সর্ব্বত্র জনসাধারণ ছিল ভীত-সন্ত্রস্ত ও নিষ্ক্রিয়। কাজেই দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস একটী লোক কারাগারের অন্তরালে তিল তিল করিয়া যে জীবন আহুতি দিতেছিল, সে বিষয়ে আসিল না কোন বাহ্যিক চাঞ্চল্য।

এদিকে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীগণ লাহোর জেলে রাজনৈতিক কয়েদীদের status নির্দ্ধারণের মূল প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া অনশন সুরু করেন। উক্ত অনশনের নেতৃত্ব করিতেছিলেন বাংলা দেশের বীর সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ী যতীন দাস। দীর্ঘদিন যাবৎ অনশন সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে তখন তুমুল উত্তেজনা চলিতেছিল।

পরাধীন দেশের জনগণের সমবেত আশা ভরসা বা আবেদনকে বৈদেশিক সরকার নিষ্ঠুর তাচ্ছিল্যের সহিত অগ্রাহ্য করিল। মর্ম্মান্তিক সেই ঐতিহাসিক শেষ পরিণতি প্রতিরোধ করা চলিল না। বীরের মত যতীন দাস তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন লাহোর কারাভ্যন্তরের নির্জ্জন কুটুরীর মধ্যে।

এই অপূর্ব্ব মহাপ্রয়াণ ও তৎপরে তাঁহার নশ্বরদেহ সহ লক্ষ লক্ষ বেদনা-বিক্ষুব্ধ জনসমষ্টির বিরাট শোক যাত্রা—সমগ্র দেশের মধ্যে এক তীব্র বিক্ষোভের প্লাবন আনয়ন করে।

বীর যতীন দাসের এই আত্মদানের পর সমগ্র দেশের দৃষ্টি পতিত হইল দূরবর্ত্তী প্রান্তের এক কারাভ্যন্তরে অবস্থিত সতীন্দ্র-নাথের উপর। তাঁহার অনশন তখন সত্তর দিবস অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। সুদৃঢ় মজবুত দেহের অধিকারী সতীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়াছেন। উভয় পদের উরুদ্বয়ের স্নায়ুসমূহের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া পেশীসমূহ অবশ হইয়া গেল (anasthetic)। ধমনীর রক্তের চাপ ছিল ন্যূনতম পর্য্যায়ে এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া চলিতেছিল নিস্তেজরূপে। দেহের পশ্চাৎ-দেশের সমস্ত চামড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটক দ্বারা ক্ষত হইল। শ্বাস-প্রশ্বাস চলিতেছিল অতি মৃদুভাবে।

জেল সুপার ও সিভিল সার্জ্জেণ্ট আইরীশবাসী মেজর ম্যাকসুইনী সতীন্দ্রনাথের দৈহিক অবস্থা দেখিয়া হইলেন বিশেষ-ভাবে স্তম্ভিত। তাঁহার ডাক্তারী শাস্ত্রের কোন সূত্রই খুঁজিয়া পাইলেন না—কিভাবে সতীন্দ্রনাথের জীবন বায়ু এখনও রক্ষা পাইতেছে। সতীন্দ্রনাথের অন্তিম মুহূর্ত্ত যে কোন সময়ে উপস্থিত হইতে পারে,—উচ্চ সরকারী স্থানে তাঁহার সতর্কবাণী প্রেরিত হইল।

দেশের অগণিত সন্তান অধীর বেদনায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কলিকাতার এলবার্ট হলের এক বিরাট জনাকীর্ণ সভায় সভাপতি-

রূপে অধ্যাপক জে, এল, ব্যানার্জ্জী দেশবাসীর অন্তরের কথা দৃঢ়কণ্ঠে ও উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে ব্যক্ত করিলেন। উত্তেজিত কণ্ঠে আপনভোলা অধ্যাপক নৃপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করিলেন—"মরবার আগে জেল ভেঙ্গে সতীন সেনকে ছিনিয়ে আনব।" অবশ্য উভয়েই কারাদণ্ড গ্রহণের দ্বারা এজন্য পরে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন।

আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা কবিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে সুভাষচন্দ্র, জে, এম, সেনগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ছুটিলেন বরিশাল জেলে সতীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য। পুলিশের অত্যাচারের দাপটে বরিশালের জনচিত্ত এতদিন ছিল অর্গলবদ্ধ. অকস্মাৎ উহার অর্গলমুক্ত হইয়া যেন এক গভীর আকুল উত্তেজনার প্রবল প্রবাহ সুরু হইল। মনে হইতেছিল যেন, যে সমস্যা এতদিন ছিল শুধু মাত্র বরিশালের নিজস্ব—নেতৃবৃন্দের আগমনের সাথে সাথে উহার গতি ও প্রকৃতি পালটাইয়া সমগ্র দেশের সমস্যায় রূপায়িত হইল।

বরিশাল জেলের অভ্যন্তরে আসিলেন সুভাষচন্দ্র ও সেনগুপ্ত। আসন্ন মৃত্যুর সম্মুখীন সতীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহের ক্ষীণ কঙ্কালসার কাঠামোখানা শয্যার উপর ছিল শায়িত। উদগত অশ্রু প্রতিরোধে অক্ষম সুভাষচন্দ্র প্রবেশ করিলেন কারাকক্ষে।

সতীন্দ্রনাথের একটী হস্তধারণ করিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বলিলেন—'সতীনবাবু দেশ আপনাকে চায়, আপনি মরতে পারবেন না—মরতে আমরা দেবো না!'

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর আসিল সতীন্দ্রনাথের কণ্ঠ হইতে—"কে বলে আমি মরতে চাই? আমার যে অফুরন্ত কাজ এখনও বাকী রয়েছে।"

—"বলুন, তবে আমরা কি কর্ত্তে পারি?"

—"এতবড় একটা insult, এতবড় public betrayal এর বিরুদ্ধে কি কেউ দাঁড়াবে না? আপনারা এখন ভার নিন।"

ক্ষণিক স্তব্ধ থাকিয়া পুনরায় সতীন্দ্রনাথ বলিলেন—"আমার খেয়াল খুসী মতে অনশন কচ্ছি না—আমার শেষ শক্তি দিয়ে এর প্রতিকার করবো;—আমি বিশ্বাস করি right cause sincerly পালন কর্ত্তে পারলে দুনিয়ায় এমন শক্তি নেই যে আমায় আটকায়।"

গভীর আত্মবিশ্বাসের মূর্ত্তিমান জ্বলন্ত প্রতীকরূপে শায়িত কঙ্কালসার সতীন্দ্রনাথের ক্ষীণ কণ্ঠের সে ক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাস নেতৃবৃন্দের অন্তর স্পর্শ করিল। গভীর আবেগের সহিত নেতৃবৃন্দ সতীন্দ্র-নাথকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—"জনসাধারণের পক্ষ থেকে আপনার কর্ম্মের ভার আমরা গ্রহণ করলুম। এখন আপনাকে অনশন ভঙ্গ কর্ত্তেই হবে।"

কক্ষে শান্ত নিস্তব্ধতা!

স্তব্ধ সতীন্দ্রনাথেব উজ্জ্বল চক্ষু দুইটী সন্ধ্যার বিলীয়মান আকাশের দিকে রহিয়াছে ন্যস্ত। অপলক দৃষ্টিতে তিনি অনন্ত আকাশের মধ্যে তখন কি বস্তুর সন্ধান করিতেছিলেন, কে জানে!

সহসা নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস মোচন করিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বেশ তাই হোক। আমি খাদ্য গ্রহণ কচ্ছি তবে তা হবে Liquid। যখন বুঝবো সব ঠিক চলছে, solid food খাব তখনই। তার আগে নয়।"

গভীর আনন্দের সহিত নেতৃবৃন্দ এই সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিলেন। অবিলম্বে কমলা লেবুর রস প্রস্তুত করিয়া আনিবার জন্য সুভাষ চন্দ্র নির্দ্দেশ পাঠাইলেন। অবশেষে সুভাষচন্দ্রের হস্ত হইতেই লেবুর রস লইয়া সতীন্দ্রনাথ পান করিলেন ধীরে ধীরে।

নেতৃবৃন্দ কোন সংবাদ বহন করিয়া আনিবে, উৎকণ্ঠিত আগ্রহে সহস্র সহস্র বরিশালবাসী রাজাবাহাদুরের হাবেলীর সেই টাউন-হল প্রাঙ্গণে রহিয়াছেন উঁহারই প্রতীক্ষায়। স্থির, গম্ভীর নেতৃদ্বয় প্রবেশ করিলেন টাউন হলে। আন্তরিকতার গভীর আবেগে ধীর ও সংযত কণ্ঠে সুভাষচন্দ্র বলিলেন—"সতীন্দ্রনাথ অনশন ভঙ্গ করেছেন।"

সহস্র কণ্ঠে উদ্দাম আনন্দ কোলাহল ধ্বনি উত্থিত হইল। জনতাকে শান্ত করিয়া সুভাষচন্দ্র বিবৃত করিলেন সতীন্দ্রনাথের সহিত তাঁহাদের যাবতীয় কথা। সতীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা, তাঁহার কথা বলিবার দৃঢ় ভঙ্গিমা, তাঁহার আত্মবিশ্বাসের কথা এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার দাবীর কথা বলিতে বলিতে সুভাষচন্দ্র তাঁহার উদগত চক্ষের জল এবার আর রোধ করিতে পারিলেন না—দুই চক্ষের জলধারা এবার বহিয়াই চলিল। স্তব্ধ, বিচলিত সেই জনতা আকুল আগ্রহে শ্রবণ করিল সতীন্দ্রনাথের সেই দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা।

দীপ্ত তেজে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করিলেন যে, জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহারা যে প্রতিশ্রুতি সতীন্দ্রনাথের নিকট দিয়াছেন তাহা পূর্ণ ভাবে পালন করিতেই হইবে। সমগ্র দেশ এখন সতীন্দ্র নাথের দাবী পূরণ করিবে। এই প্রসঙ্গেই তিনি উল্লেখ করিলেন, বেঙ্গল কাউন্সিলে মুখ্য সচিব মিঃ প্রেন্‌টিসের ভাষণ—"Barisal is the Storm Centre, and Satin Sen is the Stormy petrel. The question of his release, even on bail is fantastic"—বরিশাল হইল ঝঞ্ঝা কেন্দ্র আর সতীন সেন উহার ঝঞ্ঝা পক্ষী। জামিন দ্বারা তাহার মুক্তির কথা বিবেচনা করাও অচিন্ত-নীয়। সুতরাং সতীন সেনকে বাঁচাইতেই হইবে।

নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের ফলে দেশের চতুর্দিকে প্রবল আন্দোলন সুরু হইল। এবং এই আন্দোলনের পরিবেশে মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী হাইকোর্টে আবেদন করিলেন সতীন্দ্রনাথ ও তাহার সহ-কর্মীদের জামীনে মুক্তির জন্য। সতীন্দ্রনাথকে জামীনে মুক্তির জন্য বরিশাল কর্ত্তৃপক্ষ বিশ হাজার টাকার জামীনদারের দাবী করিয়া-ছিলেন এবং উপযুক্ত জামীনদার অগ্রণী হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল। এইভাবে তাঁহাকে ও তাঁহার সহকর্মীদের জামীনেও মুক্তি না দিয়া আটক রাখাই ছিল জেলা কর্ত্তৃপক্ষের একান্ত মত-লব। সুতরাং হাইকোর্টের নিকট জেলা কর্ত্তৃপক্ষের চাতুর্য্য ধরা পড়িল, ফলে সকলকেই উপযুক্ত সাধারণ ব্যবস্থার জামীনে মুক্তির হুকুম দেওয়া হইল।

সতীন্দ্রনাথের সহকর্মীগণকে জামীন দ্বারা মুক্ত করা হইলেও

তিনি জামীন দ্বারা বাহির হইলেন না। তাঁহার মূল দাবী রহিয়াছিল অস্বীকৃত।

নেতৃবৃন্দের সহিত সতীন্দ্রনাথের বোঝা-বুঝির মধ্যে হয়তো কিছু ফাঁক রহিয়াছিল। কেন না সতীন্দ্রনাথ যে ভাবে বাহিরের কার্য্যাবলীর অগ্রগতি হইবে বলিয়া মনে করিয়াছিলেন কার্য্য ঠিক সেই ভাবে চলিতেছিল না। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি পুনরায় অনশন সুরু করিলেন—কয়েক সপ্তাহ যাবৎ যে তরল খাদ্য গ্রহণ করিতেছিলেন তাহাও বন্ধ করিলেন। আন্দোলনকে তীব্রভাবে গতিশীল করিবার জন্য এবার নিজের উপর ভীষণ ঝুঁকি লইলেন। শুধু অনশন নয়,—জলটুকু পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন।

জেলা সুপার প্রমাদ গণিলেন। ২।৩ দিনের মধ্যে সতীন্দ্রনাথের অবস্থা অতীব সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইল। রক্তের চাপ একেবারে বিপদজনক সীমারও নিম্নমুখী দেখা গেল। ইহার উপর হিক্কা ও সর্ব্ব দেহে তীব্র জ্বালা যন্ত্রণা প্রকাশ পাইল। অন্তিম সময় যেন আগতপ্রায়।

সতীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থার বিষয়ে দৈনিক বুলেটিন প্রকাশ করা হইল জেল কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে। উক্ত বুলেটিন মুদ্রিত করিয়া হাজার হাজার কপি প্রত্যহ বিতরিত হইতেছিল সমগ্র জেলায়।

ইতিমধ্যে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ডোনোভন অকস্মাৎ বরিশাল পরিত্যাগ করিয়া একেবারে ইংলণ্ড চলিয়া গেলেন। অতিরিক্ত

জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হাচিংস্-এর উপর অর্পিত হইল জিলার ভার।

বরিশাল সহরে তখন ১৪৪ ধারা জারী করা ছিল। কিন্তু উক্ত আদেশ অমান্য করিয়া প্রত্যহ বহু সহস্র লোকের জনতা সমগ্র সহর প্রদক্ষিণ করিয়া দাবী করিতেছিল সতীন্দ্রনাথের মুক্তির। কর্তৃপক্ষ রহিল অচল।

এদিকে হাইকোর্টে মিঃ বি. সি. চ্যাটার্জীর আবেদন ক্রমে সতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীদের বিরুদ্ধে আনিত ১১০ ধারার বিচারের সুনানী বরিশাল হইতে পরিবর্ত্তিত হইয়া কলিকাতার প্রেসীডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের আদালতে আনয়ন করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল।

অনশনের চরম পরিণতিতে জীবন-মরণ অবস্থার অতি সন্নিকটে উপনীত হইয়াও সতীন্দ্রনাথ একটী বিষয়ে ছিলেন স্থির নিশ্চিত যে মৃত্যুর ক্রোড়ে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিবেন না। তিনি হইলেন বাস্তবে রাজনীতিজ্ঞ; সুতরাং তাঁহার সংগ্রামের উদ্দেশ্যে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির জন্য যে প্রকারের অবস্থা বা situation উপস্থাপিত করা আবশ্যক, সেই পর্য্যন্ত তিনি চলিবেন—উহার অধিক দূরে অগ্রসর হওয়া তাঁহার বিবেচনায় ছিল মারাত্মক ভুল। সুতরাং যখন তিনি দেখিলেন সমগ্র দেশ, বিশেষ ভাবে বরিশালবাসী এখন বিপদ ও লাঞ্ছনার ভয়ে ভীত বা সন্ত্রস্ত না হইয়া সদপে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য বহুলাংশে কার্য্যকরীভাবে সফলতা অর্জ্জন করিল। অনশনের মধ্য দিয়া জনসাধারণের

মনোবলকে যখন পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইলেন তখনই সতীন্দ্রনাথ স্থির করিলেন অনশন ভঙ্গ করিবার উপযুক্ত সময় আগত হইয়াছে। সুতরাং যখন তাঁহার অগ্রজ শ্রীহেমচন্দ্র সেন মহাশয় বিশেষ আকুল ভাবে জনসাধারণের মর্ম্মবাণী প্রকাশ করিয়া অনশন ভঙ্গ করিবার দাবী করিলেন তখন আর সতীন্দ্রনাথ উহা প্রত্যাখ্যান করিলেন না। এই ভাবে ১০৮ দিন পরে সতীন্দ্র-নাথ তাঁহার অনশন সম্পূর্ণভাবে ভঙ্গ করিলেন। এই সংবাদ সমগ্র দেশে বিরাট শান্তি আনয়ন করিল।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে যে, সতীন্দ্রনাথ জামীন গ্রহণ না করিয়াই জেলে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অনশন ভঙ্গ করিবার অনতিবিলম্বেই বরিশাল জেল হইতে তাঁহাকে অন্যত্র পাঠাইবার আয়োজন এরূপ গোপনে সম্পাদিত হয় যে, বরিশাল সহরে কেহই উহা পূর্ব্বে জানিতে পারে নাই। গভীর রাত্রির অন্ধকারে বিশেষ একটী ষ্টীমার যোগে তাঁহাকে খুলনা সহর পর্য্যন্ত আনা হয় এবং তৎপরে রেল যোগে খড়গপুর পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়া পুলিশের বিশেষ গাড়িতে মেদিনীপুর জেলে তাঁহাকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

সতীন সেন
মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে)

তরুণ কর্ম্মীবৃন্দ সহ কর্ম্মবীর)
(পটুয়াখলী সত্যাগ্রহ কালে)
—১৯২৭—
বাম দিক হইতে—আশু মুখার্জ্জী, জয়ন্ত দাশগুপ্ত, যতীশ সেন,
সতীন্দ্রনাথ, শুশিল রুদ্র, ভূপেন মুখার্জ্জী এবং অপর একজন।
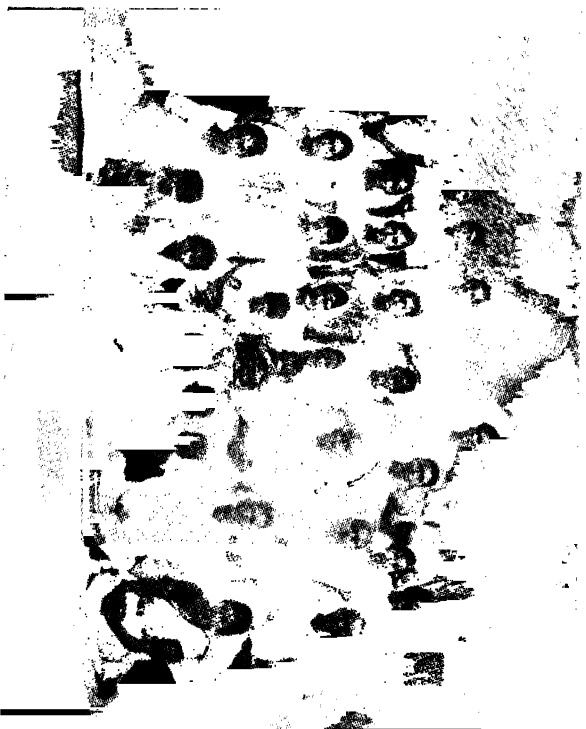
সতীন্দ্রনাথের পরিবার বৃন্দ

দক্ষিণ দিক হইতে উপবেশিত—শ্রীহেমচন্দ্র, ৺নগেন্দ্র বিহারী, শ্রীমহেন্দ্র নাথ (সম্মুখে উপবিষ্ট), ৺শৈলেন্দ্র বিহারী, বিমাতা, বড় বৌদি, ছোট বৌদি, বৌদি এবং অন্যান্য ভগ্নী, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি আত্মীয় পরিজন।

মিঃ রক্সবার্গের বিচার ও দণ্ডদান

কলিকাতায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ রক্সবার্গের আদালতে বিচার দীর্ঘদিন যাবৎ চলিল। মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী মামলা পরিচালনা করেন। যতীশ দারোগা হত্যার আসামী রমেশকে সতীন্দ্রনাথের অনুচর এই প্রমাণ সংযোজিত করিয়া, সত্যাগ্রহকালীন যাবতীয় ঘটনাবলী যুক্ত করিয়া এবং লাউকাঠি, মুরাদিয়া, আউলিয়াপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানের টেক্স বন্ধের আন্দোলন প্রভৃতি পরিচালনার অগ্রণী রূপে প্রমাণিত করিয়া সতীন্দ্রনাথকে দোষী সাব্যস্ত করা হইল এবং রায় দেওয়া হইল তিন বৎসর সৎভাবে চলিবার জন্য তিন হাজার টাকার জামীনদার প্রদান, অন্যথায় ৩ বৎসরের জন্য সশ্রম দণ্ডভোগ। তাঁহার সহকর্ম্মীদের মধ্যে কাহারও এক বৎসরের জন্য এক হাজার টাকার জামীনদার প্রদান এবং কতিপয় কর্ম্মীর বেকসুর খালাসের আদেশ দেওয়া হইল। উক্ত সহকর্ম্মীদের মধ্যে হীরালাল দাশ গুপ্ত, দেবেন দত্ত, শ্রীমন্ত ভট্টাচার্য্য, ফণী চ্যাটার্জী, দীনেশ সেন, রবি রায় প্রভৃতি ছিলেন অন্যতম।

এই রায় দান প্রকাশিত হইবার সাথে সাথেই টাকীর জমিদার শ্রীযুত যতীন রায় চৌধুরী মহাশয় অযাচিতভাবে ৩০০০৲ টাকা জমা দিয়া সতীন্দ্রনাথের জামীনদার হইবার প্রার্থনা করিলেন এবং জামীন গৃহীত হইল। অবশ্য পরে সে জামীনও বাজেয়াপ্ত হওয়ায় পাবনার শিতলাইয়ের জমিদার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয় নূতন ভাবে জামীনদার হইয়াছিলেন।

কংগ্রেস রাজনীতি

পিরোজপুর জেলা সম্মেলনের পর বরিশাল কংগ্রেসের দায়িত্ব সতীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক গ্রহণের অব্যবহতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের কর্ত্তৃত্ব ছিল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের উপর। বিপ্লববাদী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় তখন ছিলেন দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের স্বরাজ পার্টি সংগঠনের পক্ষে। সুতরাং বিনা ক্লেশেই কংগ্রেসের ক্ষমতা ও প্রভাব, স্বরাজ্যপার্টিকে কেন্দ্র করিয়া পরিবর্ত্তিতরূপে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। তথাপি জনসাধারণের একটী বিপুল অংশের উপর তখনও যেন শ্রীযুক্ত ঘোষের প্রভাব ছিল অতীব গভীর। তাঁহার ও তদনুগামী শ্রীসুরেশচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের গান্ধী-নীতির উপর অকপট বিশ্বাস থাকায় ও নিজ নিজ জীবনে উহ প্রতিফলিত করিবার তীব্র প্রচেষ্টা থাকায় সাধারণ লোকেরা বিশেষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিত। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত ঘোষের অননুকরণীয় বাগ্মিতা সমগ্র জেলার এমনকি বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু পারিবারিক বন্ধন ত্যাগ করিয়া গান্ধী-নির্দ্দেশিত কার্য্য করিতে করিতে সহসা প্রাণের আবেগে কর্ম্মী শরৎচন্দ্র বরিশাল ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান ও সেখানে সন্ন্যাস

গ্রহণ করতঃ নূতন নাম গ্রহণ করেন—"স্বামী পুরুষোত্তমানন্দ"। শ্রীযুক্ত ঘোষ মহাশয়ের বরিশাল পরিত্যাগে গান্ধী-পন্থী কংগ্রেসীদের কর্ম্ম-প্রসারতায় তীব্র আঘাত পড়িল।

অসহযোগ আন্দোলনের প্রারম্ভে, জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক থাকা কালীন সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (পরবর্ত্তীকালে অধ্যাপক এম্, এ, পি এইচ্, ডি) "বরিশাল" নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিতেন। রাজনীতি হইতে সুধীরকুমারের অবসর গ্রহণের পর উক্ত পত্রিকার প্রকাশ ভার গ্রহণ করেন তাঁহার অনুগামী শ্রীযুক্ত বিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, বর্ত্তমানে যুগান্তর পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। সুতরাং এই 'বরিশাল' পত্রিকাকে অবলম্বন করিয়া স্থানীয় বিপ্লববাদী তরুণ-যুবকদল এবং স্বরাজ পার্টির অনুগত নব্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক বৃহৎ অংশ সতীন্দ্রনাথের সমর্থক হইয়া উঠেন।

কংগ্রেস সংগঠনের নির্ব্বাচনাদি মামুলী কার্য্যক্রম সতীন্দ্রনাথের নিকট বিশেষ আকর্ষণীয় মনে হইত না। কারণ উচ্চপদাধিকার বা আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রলোভন তাঁহার কখনও ছিলনা বরং জনসেবামূলক কার্য্যক্রম সৃষ্টি করিয়া, তাহারই মধ্যে লিপ্ত থাকিবার আগ্রহ ছিল তাঁহার নিকট বিশেষ প্রীতিপ্রদ। বিশেষ ভাবে তিনি আগ্রহশীল ছিলেন তরুণ ছাত্র-যুবকদের পরিবেশে থাকিতে, কারণ তাহার চিরদিনের ধারণা ছিল যে জাতীয় সংগ্রামের ভবিষ্যৎ কর্ম্মীর উদ্ভব হইবে এই সব তরুণদেরই মধ্যে। সুতরাং কি ভাবে এবং কোন কর্ম্মের মাধ্যমে তরুণদের তেজ,

বীর্য্য ও আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হইতে পারে তিনি শুধু তাহারই সন্ধানে ও আয়োজনে উৎসুক ও অধীর থাকিতেন।

অসহযোগ আন্দোলনের পরবর্ত্তীকালে বাংলা দেশের কংগ্রেস রাজনৈতিক দলে বিপ্লববাদী ও সংগ্রামশীল কর্ম্মীদের প্রভাব ছিল বিশেষ গভীর। ইহার ফলে ক্রমশঃ বাংলা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অপ্রকাশিত দল ও উপদলের উদ্ভব হইতে থাকে। বাংলা দেশের প্রায় প্রতি জেলার এক একজন বিশিষ্ট কর্ম্মীকে অবলম্বন করিয়া কংগ্রেস সংস্থার মধ্যেও গড়িয়া উঠে এইরূপ দল ও উপদল। এই সব বিভিন্ন দল-উপদলের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস সংস্থার উপর আর তাই এই প্রকারের রাজনীতি এক সময়ে vicious circle এ চলাচল করিতে বাধ্য হইত। কেননা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ক্ষমতা অর্জ্জন ছিল যেন তখনকার রাজনৈতিকগণের এক দুর্ব্বার কামনা!

এইরূপ পরিবেশে সমগ্র বরিশাল জিলার কংগ্রেসের সংগঠনীর মধ্যে সতীন্দ্রনাথের অপ্রতিরোধীয় প্রভাব পূর্ণমাত্রায় থাকিতেও কোন সময়ের জন্যও প্রাদেশিক কংগ্রেসের ক্ষমতার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার বাসনা তাঁহার ছিল না। সুতরাং প্রাদেশিক রাজনীতির বহুপ্রকারের কূটনৈতিক আদব-কায়দা বিষয়ে অনেক সময়ে তিনি ছিলেন একেবারেই 'বাঙ্গাল'। কিন্তু এজন্য তাঁহার অন্তরের বিপুল কার্য্যোন্মাদনা কখনও ব্যাহত হইত না। সুতরাং এই সকল পরিবেশে থাকিয়াও নিজস্ব

দল সৃষ্টি বিষয়ে সতীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ উদাসীন। তথাপি তাঁহার বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান এবং তীব্র [illegible] ফলে স্বভাবতই তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া সমগ্র জেলায় তরুণ-যুবক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে একটী প্রভাবশালী রাজ-নৈতিক সংস্থা গড়িয়া উঠে।

সতীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত এই সংস্থাকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রাদেশিক কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ বিবিধ কর্ম্ম পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন তাঁহার অন্তরঙ্গ সহকর্ম্মী নির্ম্মলরঞ্জন দাশগুপ্ত। তদানীং[illegible] প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের সহিত যাবতীয় যোগাযোগ নির্ম্মলরঞ্জন বিশেষ কৃতিত্বের সহিত রক্ষা করিতেন। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, কূট-কৌশলী রাজনীতিজ্ঞ রূপে অনতিবিলম্বেই তিনি লোকসমাজে স্বীকৃত হইলেন। এইভাবে কংগ্রেস কার্য্যে উদ্যোগী ছিলেন সতীন্দ্র-নাথের অন্যতম বিশিষ্ট সহকর্ম্মী তারাপদ ঘোষ। নিজস্ব দল গঠনের জন্য যে কৌশল বা কর্ম্মপন্থানুসরণের আবশ্যক হয়, সেই পথ অনুসরণে সেই দিন যদি সতীন্দ্রনাথ তাঁহার সহকর্ম্মীদের সহিত সহযোগিতা করিতেন তবে সমগ্র বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে পারিতেন।

সতীন্দ্রনাথ বরিশাল কংগ্রেসের মধ্যে যে সকল বিশিষ্ট প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে আসিয়াছেন তন্মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য ছিলেন ৺রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীনগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়। উভয়েই দীর্ঘ দিবস যাবৎ কংগ্রেসের সভাপতি

ছিলেন। ত্যাগী, উদারচেতা, আদর্শবাদী ও সত্যনিষ্ঠরূপে উভয়েই সমগ্র জিলার জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেন।

অপেক্ষাকৃত তরুণ ও প্রায় সমবয়সী বন্ধুস্থানীয় যে সমুদয় নেতৃবৃন্দের সাহচর্য্য সতীন্দ্রনাথের সর্ব্বকার্য্যে বিশেষ সহায়ক হইত তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে অগ্রণী ছিলেন ৺প্যারীলাল রায়, শ্রীঅমিয়কুমার রায় চৌধুরী, শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীসরল কুমার দত্ত, শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীচুণীলাল সেনগুপ্ত, শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন, শ্রীমৃন্ময় গুপ্ত, শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ, শ্রীঅবনী কুমার ঘোষ প্রভৃতি।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বরিশালের 'শঙ্কর মঠ' ছিল তরুণদিগকে বিপ্লবী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিবার কেন্দ্র। শ্রীযুত নিশিকান্ত গাঙ্গুলী মহাশয় আনুষ্ঠানিকভাবে মঠ পরিচালনা করিতেন। স্বামীজী কর্ত্তৃক উদ্গীত বিপ্লবী ভাবধারা প্রচার ও ক্রিয়াশীল করিবার দায়িত্ব প্রধানত গ্রহণ করেন, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ প্রভৃতি।

বরিশাল জনসমাজের প্রবীণ, বিজ্ঞ ও বয়স্ক নেতৃবৃন্দের সহিত সতীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল অতীব মধুর। সর্ব্বস্তরের ও সর্ব্ব-শ্রেণীর সমাজ-নেতাদের অকুণ্ঠ স্নেহ, প্রীতি ও সহায়তা তাঁহার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি পাইয়াছেন। অবশ্য সতীন্দ্র-নাথের বেগবান প্রবল কর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত তাল রক্ষা করিয়া চলা প্রবীণ সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভবপর হইতনা এবং সে কারণে কখন কখন মতভেদ ও বিরোধের উদ্ভব হইত বটে তবে উহা স্থায়ী

হইত না। যে কোন উল্লেখযোগ্য কার্য্য সুরু করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের উপদেশ তিনি গ্রহণ করিতেন। হয় তো সব সময়ে উপদেশানুযায়ী কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইত না, কিন্তু সেই কারণে কাহাকেও অগ্রাহ্য বা তাচ্ছিল্য করা ছিল তাঁহার সম্পূর্ণ নীতি-বহির্ভূত কার্য্য। সুতরাং যেমন তিনি ৺শরচ্চন্দ্র গুহ, ৺গোপালচন্দ্র বিশ্বাস, বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীদুর্গামোহন সেন প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উপদেশ প্রার্থনা করিতেন, তেমনি আবার সরকার-পক্ষীয় রায় বাহাদুর গণেশচন্দ্র দাস, ইন্দুভূষণ সেন, মৌলবী হাসেমালী, মৌলবী হিমায়েতউদ্দীন প্রভৃতির নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। ঠিক একই কারণে তিনি তদানীন্তন কালের মন্ত্রী মহারাজা ক্ষৌণীশচন্দ্র রায়, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র প্রভৃতির সহিত বিশেষ ভাবে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়া সরকারী মতিগতি বিষয়ে বহু প্রয়োজনীয় সংবাদ আহরণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

* * * *

নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে :

পটুয়াখালী সত্যাগ্রহ উপলক্ষ্যে সতীন্দ্রনাথ একজন বীর কর্ম্মী নেতা রূপে সমগ্র দেশে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তদানীন্তন কালের বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় হইবার সুযোগ তাঁহার বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইরূপ ভাবেই পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, ডাঃ মুঞ্জে, লালা লাজপত রায়,

পদ্মরাজ জৈন ও মিঃ জি, ডি, বিরলা প্রভৃতির সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

সতীন্দ্রনাথের প্রতি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়র ছিল গভীর স্নেহ ও প্রীতি। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি সতীন্দ্রনাথকে বক্ষে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিয়া তাঁহার সেই প্রগাঢ় প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ করেন। পর দিবস বিদ্বজ্জন সমাকীর্ণ বহুজন পরিবৃত মালবীয়জীর গৃহে সতীন্দ্রনাথ প্রবেশ করিবামাত্রই মালবীয়জী আসন পরিত্যাগ করিয়া বলিয়া উঠিলেন—'Let us all honour the hero of Bengal'। উপস্থিত সকলেই দণ্ডায়মান হইয়া সতীন্দ্রনাথকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন অধ্যক্ষ ধ্রুব, ডাঃ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথনাথ তর্কালঙ্কার প্রভৃতি বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ।

নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহের পর এই পটুয়াখালীর ন্যায় অখ্যাত স্থানে প্রতিদিন সত্যাগ্রহ পরিচালনার দুঃসাহসিকতার জন্য সতীন্দ্রনাথের প্রতি সর্ব্বস্তরের নেতৃবৃন্দের সম্ভ্রম আকৃষ্ট হয়। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, শ্রীরাজেন্দ্রপ্রসাদ, ভাই পরমানন্দ, জহরলাল নেহরু প্রভৃতি বহির্বঙ্গের নেতৃবৃন্দের সহিত ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। এই আন্দোলনের পরই গান্ধীজীর দৃষ্টিও সতীন্দ্র-নাথের উপর বিশেষ ভাবে পতিত হয়।

সুতরাং সর্ব্ব ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করা এবং উপযুক্ত স্থান অধিকার করিবার বিশেষ সুযোগ সতীন্দ্রনাথের নিকট উপস্থিত হইল। যে সমস্ত বিশেষ গুণাবলী থাকিলে

জন-নেতা বলিয়া স্বীকৃত হওয়া চলে সতীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রায় তাহার সবই ছিল কিন্তু তিনি সর্ব্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরের কথা প্রাদেশিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সেইরূপ কোন বিশিষ্ট স্থান কখনও গ্রহণ করিতে পারেন নাই। এই অক্ষমতার প্রধানতম কারণ ছিল তাঁহার নিজের মধ্যে। সর্ব্বভারতীয় বা প্রাদেশিক জন-নেতা হইতে হইলে যে প্রকারের প্রস্তুতি আবশ্যক সে বিষয়ে সতীন্দ্রনাথ বরাবরই ছিলেন বিরত। জীবনের প্রারম্ভ হইতে একটী বিষয়ের উপর তাঁহার সর্ব্বচিন্তা, ও সর্ব্ব আবেগ নিয়োজিত ছিল, আর তাহা হইল—জাতীয় ক্লীবতা, জড়তা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত সংগ্রামে আত্ম-বিশ্বাস, দুর্জ্জয় সাহসিকতা ও আত্মসম্মানের প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যখন যেখানে ভীরুতা বা অবমাননাময় অবস্থার সম্মুখীন তিনি হইয়াছেন, তখনই তাহার বিরুদ্ধে ছিল তাঁহার কঠোর সংগ্রাম। যদি তিনি নেতৃত্বের দিকে দৃষ্টি আরোপ করিয়া চলিতেন তবে হয় তো তাঁহার জীবনের বহুবিধ সংঘর্ষকে অবলীলাক্রমে বাদ দিয়া সুযোগ-সুবিধা মত রাজনৈতিক পরিষদের উচ্চস্তরে আরোহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল না কোন ফাঁকা খ্যাতির প্রলোভন আর তাই প্রতিপত্তি ও নামের পরিবর্ত্তে অন্তরের পূর্ণতার বিকাশই ছিল তাঁহার নিকট চিরন্তন ও শাশ্বত ধর্ম্ম।

● ● ●

বিভিন্ন গণ-আন্দোলনের মধ্যে অহিংসার প্রয়োগ বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী বলিয়া সতীন্দ্রনাথের নিকট প্রতীয়মান হইল। অহিংসাকে জীবনের নীতি বা creed ভাবে গ্রহণ না করিয়াও উদ্দেশ্যসিদ্ধির কৌশল রূপে গ্রহণ করা যায়, করিলে সার্থকতা ও সফলতার আলো দেখা যায়—এই ভাবধারার প্রতি তাঁহার বিশেষ কৌতূহল জাগ্রত হইল।

১৯৩০ সনের লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান করিবার প্রাক্কালে গান্ধীজীর নিকট উপস্থিত হইলেন সতীন্দ্রনাথ। প্রায় ৭ দিবস তিনি ছিলেন সবরমতী আশ্রমে। গান্ধীজীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে থাকিবার ফলে তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে এক নূতন জীবন দর্শনের পথ খুলিয়া গেল। সতীন্দ্রনাথের পরবর্ত্তী জীবনের ভাবধারা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল গান্ধীজীর আদর্শে।

সবরমতী আশ্রম পরিদর্শন করিবার পর পুনরায় সতীন্দ্র-নাথকে জেলে প্রবেশ করিতে হইল। বরিশাল জেল গেটে গণ্ডোগোলের দরুণ তিনি দণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। বন্দী সতীন্দ্রনাথকে প্রেরণ করা হইল মেদিনীপুর সেণ্ট্রাল জেলে।

লবণ আইন অমান্যের উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযান সমগ্র ভারতবর্ষে এক অভাবনীয় উদ্দীপনা ও উৎসাহ সৃষ্টি করে এবং ক্রমে সর্ব্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপক ভাবে সুরু হয়। এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৩০ সনের

জুন মাসের শেষের দিকে সতীন্দ্রনাথ মেদিনীপুর জেল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন।

ইতিমধ্যে আইন অমান্য সুরু হইবার পূর্ব্বেই কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ও বিশিষ্ট কর্ম্মীগণ কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন সুতরাং এই আন্দোলনের প্রস্তুতির কার্য্যাদি করিবার তাঁহার সুযোগ ছিল না। আবার দীর্ঘ দিবস এইজন্য তাঁহার বাহিরে থাকিবার সম্ভাবনাও ছিল কম—যে কোন সময়ে পুনরায় গ্রেপ্তার হইবার আশঙ্কাই তাঁহার ছিল। সুতরাং বরিশালে গমন করিয়া আন্দোলনকে পরিচালনা করিবার এখন আর কোন বিশেষ সুযোগ রহিল না। কাজেই তাঁহার উপস্থিত অল্প সময়ের মধ্যেই এমন এক আন্দোলনে ও কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত যাহা বিশেষ কার্য্যকরী হইতে পারে।

ছাত্র-আন্দোলনে

তখন কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ উভয় দলের সমর্থক দুইটী ছাত্র-প্রতিষ্ঠান নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি (A. B. S. A) এবং বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র সমিতি (B. P S. A) একযোগে স্কুল-কলেজ বর্জ্জন আন্দোলন সুরু করেন। এই কার্য্যে প্রবল ও নিষ্ঠুর বাধা আসিল প্রেসিডেন্সী কলেজের সম্মুখে। পুলিস সার্জেণ্টদের বেপরোয়া লাঠির আঘাতে পিকেটিংকারী ছাত্রদলকে একেবারে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। সমস্যার উদ্ভব হইল—হয় আগাইতে হইবে, নচেৎ পরাজয় স্বীকার করিতে হইবে। সম্মুখে রহিয়াছে দুস্তর বিপদ আবার পশ্চাতে দারুণ অপমান। এরূপ দুরূহ সমস্যায়

কাহার নিকট তাহারা নির্দ্দেশ লইবেন—এমন কে আছেন যিনি তাহাদের বল, ভরসা ও সাহস দিতে পারেন ?

এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই ছাত্রদল আসিলেন সতীন্দ্রনাথের নিকট—তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানাইবার জন্য।

ছাত্রদের আইন-অমান্য আন্দোলনের বর্ত্তমান পরিস্থিতির মধ্যে অহিংসার প্রতিরোধ শক্তির সম্ভাবনা কতদূর থাকিতে পারে—সেই দৃষ্টিতে তিনি এই সমস্যাকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন এবং ছাত্র সম্প্রদায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণে স্বীকৃত হইলেন। সর্ত্ত স্থির হইল যে পুলিসের নির্ম্মম লাঠি-বেটনের নিকট পরাজয় স্বীকার করা চলিবে না—স্বেচ্ছায় দুর্জ্জয় সাহসের সহিত উহা অগ্রাহ্য করিতে হইবে সম্পূর্ণ অহিংসভাবে। যতই আঘাত আসুক না কেন কখনও পশ্চাৎপদ হওয়া চলিবেনা। যৌবনের দুর্জ্জয় শক্তির এক নূতন মহিমা প্রদীপ্ত করিতে হইবে হিংস্র পাশবিক শক্তির বিরুদ্ধে—আত্মীক শক্তির প্রতিষ্ঠায়।

মানুষের হৃদয় কন্দরে সুপ্ত রহিয়াছে যে অফুরন্ত শক্তি, উহাকে জাগরিত ও সম্বুদ্ধ করিবার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল সতীন্দ্রনাথের। ভীরুতা বা দুর্ব্বলতার দৃষ্টান্ত ছোঁয়াচে রোগের ন্যায় যেমন ভীরুতাই সৃষ্টি করে, তেমনি বীরত্বপূর্ণ কার্য্যাদির আদর্শ আকৃষ্ট করে গভীর উচ্চ কর্ম্মোন্মাদনার।

নির্দ্দয় ও হিংস্র পুলিসী প্রহারের সম্মুখে সর্ব্ববিপদ অগ্রাহ্য করিয়া বীর হৃদয়ে অগ্রসর হইতে পারে এরূপ নির্ব্বাচিত নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক স্বেচ্ছাবাহিনীর দল পর পর আগাইয়া চলিল পুলিসের

বিরুদ্ধে আত্মীক শক্তির প্রতিষ্ঠায়। মুহুর্মুহু পুলিস সার্জ্জেণ্টদের আঘাতের তীব্রতায় কাহারও মস্তক চূর্ণ হইয়া দেহ রক্তাপ্লুত হইল, কেহ রক্তাক্ত দেহ লইয়াই দ্বিতীয় প্রহারের জন্য আগাইয়া চলিল, কিন্তু পশ্চাৎপদ কেহই হইল না—হয় পথিপার্শ্বে চেতনা-বিহীন হইয়া পড়িল, অথবা পুলিসের লৌহবলয় বরণ করিল। একদলকে গ্রেপ্তার করে তো পুনরায় নূতন দল আগাইয়া আসেন—পুনরায় রচিত হয় একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি! 'ধর্ষণারই' যেন আর এক ক্ষুদ্রাকৃতি অনুষ্ঠান!

প্রবীণ নেতৃবৃন্দ প্রমাদ গণিলেন। সতীন্দ্রনাথের এই প্রকারের বেপরোয়া ভয়ঙ্কর কার্য্যাবলী তাঁহারা অনুমোদন করিলেন না। এরূপ কথাও উঠিল যে—তিনি নিজে বাহিরে থাকিয়া এই নিষ্ঠুর প্রহারের মধ্যে পাঠাইতেছেন কতিপয় অনভিজ্ঞ তরুণদের—প্রবীণদের মতে ছিল ইহা নিতান্তই অনুচিত কার্য্য। সুতরাং এই বেপরোয়া কার্য্য স্থগিত রাখিবার জন্য সতীন্দ্রনাথের অগোচরে চলিল বিশেষ প্রচেষ্টা। এই ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়াই ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সহিত সতীন্দ্রনাথের বাধিয়াছিল তুমুল সংঘর্ষ। ইহারই ফলে বোধ করি পরবর্ত্তী জীবনে উভয়ের প্রতি বন্ধুবৎ আকর্ষণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মিঃ টেগার্ট ছিলেন পুলিসের কার্য্যের নিয়ন্ত্রক। বেদম প্রহারের দ্বারাও যখন ছাত্রদের অগ্রগতি প্রতিহত করা চলিল না তখন দৃষ্টি পড়িল সতীন্দ্রনাথের প্রতি। এই প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল শক্তি ও প্রেরণার কেন্দ্রস্থল ছিলেন সতীন্দ্রনাথ। সুতরাং

অগৌণে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং প্রেরণ করা হইল প্রেসিডেন্সী জেলে।

*   *   *   *

প্রেসিডেন্সী জেলের হাঙ্গামা

১৯৩০ সনের জুন মাসের শেষ সপ্তাহে গ্রেপ্তার হইয়া সতীন্দ্রনাথ বিচারাধীন বন্দীরূপে প্রেসিডেন্সী জেলে প্রবেশ করেন। উক্ত জেলে আইন-অমান্যকারী বন্দীদের সংখ্যা ছিল ৬।৭ শত এবং সকলেই ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর বন্দী। অনভিজ্ঞ তরুণ বন্দীদের সুপরিচালনার অভাবে শৃঙ্খলতাবোধ বিশেষ ছিল না। সুতরাং জেল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে তাহাদের বিবিধ অভাব-অভিযোগ প্রতিকারার্থে কোন প্রচেষ্টা সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। এমতাবস্থায় তাহাদের মধ্যে সতীন্দ্রনাথের উপস্থিতি বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করিল।

১৯৩০ সনের আইন-অমান্য বন্দীদের দ্বারা বাংলা দেশের সমুদয় জেল ছিল পরিপূর্ণ। নূতন নূতন বিশেষ জেল স্থাপন করিতে স্থান সংকুলান হইতেছিল না। ফলে সর্ব্বত্রই কারা-ব্যবস্থা প্রায় অচল হইবার উপক্রম হইল। বিশেষত বন্দীদের দৈনন্দিনের অভাব-অনুযোগের জন্য কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ বিব্রত বোধ করিতেছিলেন। এই কারণেই তখনকার ইংরেজী পত্রিকা 'Statesman' এর সম্পাদকীয়ে কর্ত্তৃপক্ষের এই নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইল। মিঃ টেগার্ট ছিলেন পুলিস কমিশনার। তাহার নিকট এই অবস্থা ছিল বিশেষ ভাবে

অসহনীয় কেন না কারাভ্যন্তরের ব্যাপারে প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করিবার কোন ক্ষমতা তাহার ছিল না। কিন্তু সেজন্য তিনি বোধ হয় নিশ্চেষ্টও ছিলেন না।

এ হেন অবস্থায় একদিন, বন্দীদের যাবতীয় অভাবাদি বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যাহাতে একযোগে মিলিত দাবী প্রেরণ করা চলে, সেই বিষয়ের এক আলোচনা সভায় সতীন্দ্রনাথ ব্যস্ত ছিলেন দ্বিতলের একটী গৃহে। বেলা তখন প্রায় ১০টা, এমন সময়ে একটী সার্জ্জেণ্ট নিম্নতলায় আসিয়া দরজার সম্মুখে উপস্থিত একটী লোকের নিকট সংবাদ দিল যে সতীন্দ্রনাথকে আদালতে যাইতে হইবে। উত্তরে সেই লোকটী সতীন্দ্রনাথ বা কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া সার্জ্জেণ্টকে বলিয়া দিল যে সতীন্দ্রনাথ আদালতে যাইবেন না—তিনি জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবেন। কোন উচ্চ-বাচ্য না করিয়া বা সতীন্দ্র-নাথের সহিত প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ না করিয়াই সার্জ্জেণ্টটিও রহস্যজনকভাবে অফিসে চলিয়া গেলেন। হয়তো বা তাহারই ফলে আসিল দুর্ব্বার নিষ্ঠুর অত্যাচার।

প্রেসিডেন্সী জেলের স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাত্রা যেভাবে প্রত্যহ চলে সেদিনও তেমনি চলিতেছিল। কোথাও কিছু নাই। বেলা ১১টা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত জেল-প্রাঙ্গণ ছিল শান্ত, স্তব্ধ ও নিশ্চিন্ত। অকস্মাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় জেলের ‘পাগলা ঘুণ্টি’ বাজিয়া উঠিল। বিমূঢ় কারাবাসী অজানা নিগ্রহের আতঙ্কে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া যে যেদিকে পারিল সেই

দিকেরই যে কোন একটী গৃহে ঢুকিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দেখিতে দেখিতে হুড় হুড় করিয়া শত শত সশস্ত্র পুলিস-সার্জেণ্ট, কারা-প্রহরী উন্মুক্ত জেল দরজার মধ্য হইতে কারাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিকট উল্লাসে ছুটিল সেই দিকে যেদিকে ছিল রাজনৈতিক বন্দীদের আশ্রয়স্থল। হতচকিত বন্দীগণ বুঝিবার অবসরই পাইল না, কোন কারণে এই দুর্দ্দমনীয় পুলিস অভিযান!

কোন উত্তর নাই, প্রত্যুত্তর নাই, কোন প্রকারের উত্তেজক ক্রিয়া-কলাপ-বিহীন নিরস্ত্র রাজনৈতিক বন্দীদের উপর দুর্ব্বার বেগে ঝাঁপাইয়া পড়িল সেই অগণিত সশস্ত্র পুলিস বাহিনী। গৃহাভ্যন্তরে আটক প্রতিটী বন্দীর উপর চলিল নিষ্ঠুর প্রহার ও অত্যাচার—কাতর যন্ত্রণায় আর্ত্ত চীৎকার ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। জানা যায় যে মিঃ টেগার্টের উপস্থিতিতেই এই সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নিপুণভাবে সম্পাদিত হইয়াছিল।

ঘটনার আকস্মিকতায় সতীন্দ্রনাথ স্তম্ভিত হইলেন। অচিরেই সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার নাম করিয়া কেহ বলিয়াছে যে তিনি আদালতে যাইতে অস্বীকার করিয়াছেন এবং তাহারই প্রত্যুত্তরে এই অভিযান! মুহূর্ত্ত মধ্যেই তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। এই অহৈতুক এবং অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদে স্বেচ্ছায় তিনি আদালতে যাইবেন না।

উন্মত্ত সার্জ্জেণ্টের দল ছুটিতে ছুটিতে আসিয়াই বিনা বাক্যব্যয়ে জোর জবরদস্তি করিয়া ধাক্কা দিয়া ঠেলিয়া সতীন্দ্রনাথকে গৃহের মেঝের মধ্যে ফেলিয়া দিল। অবশেষে সুরু হইল হস্ত পদ

আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে টানিয়া অগ্রসর করাইবার চেষ্টা। পদযুগল দৃঢ় ও কঠিন হস্তে আবদ্ধ করিয়া তাঁহাকে অপ্রশস্ত উঁচু সিঁড়ির উপর দিয়া হেঁচ্‌কাইয়া, ছেঁচড়াইয়া নিম্নমুখী আকর্ষণ করা হইল। প্রতি সিঁড়ির উপর তাঁহার অরক্ষিত মস্তক ঠোক্কর খাইতে খাইতে নিম্নতলার দিকে নামিয়া আসিল। এই প্রকারে শুধু পদযুগল ধারণ করিয়া, দেহের উন্মুক্ত অপরাংশ কঠোর কঙ্করাবৃত অসমতল পথের উপর পতিত অবস্থায় তাঁহাকে টানিতে টানিতে দীর্ঘ জেলের রাস্তা অতিক্রম করিয়া অপর প্রান্তে অবস্থিত জেল-অফিসে আনয়ন করা হইল। আঘাতে আঘাতে সমস্ত দেহ মস্তক তাঁহার ক্ষত বিক্ষত! দেহের পশ্চাদংশ কাটিয়া, ছিঁড়িয়া থেঁতলাইয়া যাইবার ফলে বিভিন্ন ক্ষতস্থান হইতে রক্তের ধারা প্রবাহিত হইতেছিল। দেহের প্রতি স্নায়ু, প্রতি তন্তুর উপর যে নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক অত্যাচার চলিল, যাতনায় মুহ্যমান সতীন্দ্রনাথের মুখ হইতে তাহাতেও একটা কাতর ধ্বনি বাহির হইল না—বাহির হইল না একটিও আর্ত্তস্বর। নৈতিক চরিত্রে বলীয়ান সতীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ আত্মস্থ চিত্তে নীরবে এই নির্য্যাতন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অসহায় সহযোগিদের বেদনার অংশ গ্রহণ করিলেন আপন শরীরের উপর পৈশাচিক আঘাত বরণ করিয়া।

অহৈতুক এই নিষ্ঠুর অত্যাচারের কোন কারণই ছিল না। সতীন্দ্রনাথ আদালতে যাইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে অনুসন্ধানও করা হইল না। তদ্ব্যতীত প্রকৃতই যদি তিনি

অস্বীকার করিতেন তাহা হইলেও জেলকোড বা অন্যবিধ কারা আইন দ্বারা তাহার শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা অবলম্বন করা চলিত। কিন্তু উহা করা হইলে তো আর পূর্ব্ব পরিকল্পনা মত রাজনৈতিক বন্দীদের উপর নির্ম্মম প্রহারের বিভীষিকাময় দৃষ্টান্ত স্থাপন করা চলিত না!

* * * *

কারাদণ্ড ও দার্জ্জিলিং জেল:

এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই সতীন্দ্রনাথকে প্রেসিডেন্সী জেলের বাহিরে অবস্থিত পৃথক সিভিল জেলে রাখা হইল। জেল গেটেই হইল বিচার। আত্ম-পক্ষ যখন তিনি সমর্থন করিলেন না, তখন অগৌণেই তাঁহার প্রতি দেড় বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। দণ্ডদানের অনতিবিলম্বেই ১৯৩০ সনের জুলাই মাসের শেষের দিকে, তাঁহাকে পৃথক বন্দীরূপে দার্জ্জিলিং জেলে প্রেরণ করা হইল।

দার্জ্জিলিং জেলে অবস্থান কালে একজন বৃদ্ধা এংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলা মাঝে মাঝে আসিতেন জেল পরিদর্শন করিতে। স্বভাবতই সতীন্দ্রনাথের প্রতি কৌতূহলী হইয়া তিনি তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন এবং বিশেষ ভাবে অভিভূতা হইলেন। বৃদ্ধা মহিলাটী ছিলেন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি W. C. Banerjeeর কন্যা এবং সৈনিক বিভাগের একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর বিধবা স্ত্রী। দার্জ্জিলিং সহরে বহুদিন যাবৎ এই মহিলাটি নানাবিধ সমাজ-কল্যাণজনক কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

সুতরাং সতীন্দ্রনাথ যখন তাঁহার পদস্পর্শ করিয়া তাঁহাকে প্রণাম জানাইলেন বৃদ্ধটী একেবারেই বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ও সতীন্দ্রনাথের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্টা হইলেন। তিনি সতীন্দ্রনাথের প্রীতি বিধানার্থে বাহির হইতে ফল.মূলও বিবিধ পুস্তক, পত্রিকাদি সংগ্রহ করিয়া দিতেন। বৃদ্ধা মহিলাটীর নির্দ্দেশে সতীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'মাসীমা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

জেলে বসিয়া প্রত্যহ সতীন্দ্রনাথ চরখায় সূতা কাটিতেন। সুতরাং তঁাহার প্রস্তুত সূতা এই মহিলাটী একদিন চাহিয়া লইয়া গেলেন। কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইলে তিনি আসিয়া সতীন্দ্রনাথকে উপহার দিলেন উক্ত সূতাদ্বারা প্রস্তুত একখানি টেবিলের "আচ্ছাদনী"।

উক্ত বস্ত্রখণ্ডের উপর অঙ্কিত ছিল বহু ক্রশ চিহ্ন। বিস্মিত সতীন্দ্রনাথকে তিনি বলিলেন—'Satin, your life is full of crucifications, is'nt it, ?' সতীন, তোমার জীবনটাই তো বহু ক্রশ-বিদ্ধ, তাই নয় কি ?

* * * *

মুক্তি ও বহিষ্কার

১৯৩১ সনের মার্চ্চ মাসে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে সতীন্দ্রনাথ মুক্ত হইলেন। কর্ম্মস্থল বরিশাল যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্রই বরিশালের শাসক-কর্ত্তৃপক্ষ সতীন্দ্রনাথের উপর বরিশাল হইতে বহিষ্কারের আদেশনামা জারী করিলেন। বাধ্য হইয়া তাঁহাকে কলিকাতায় থাকিতে হইল।

এই বহিষ্কারের আদেশের বিরুদ্ধে অধ্যাপক জে, এল, ব্যানার্জ্জীর প্রশ্নের উত্তরে স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ প্রেনটিস্ বলিয়াছিলেন —'Satin Sen is danger to the administration and the order served by the Government is justified'. বৃটিশ শাসনযন্ত্রের পক্ষে সতীন সেন ছিল এক সন্ত্রাস স্বরূপ—ইহাই ছিল কর্ত্তৃপক্ষের অভিমত।

* * * *

পিকেটিং বোর্ড গঠন

কলিকাতায় আসিয়া উঠিলেন তাঁহার সহকর্ম্মী ডাঃ প্রসূনচন্দ্র দাশগুপ্তের বাসস্থান ১৯৫নং মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে। তাঁহার শরীর ছিল বিশেষ ভাবে রুগ্ন ও অসুস্থ। পুনঃ পুনঃ দীর্ঘ অনশন ও কারাবাসের দরুণ দেহ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইল। বুকে প্লুরেসী, উরুদ্বয়ের পেশী সমূহ অবশ ও শক্তিহীন, উভয় উরুর উপরস্থিত হাড়ের সংযোগস্থলে টি, বি, আক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ করা হইল। অজীর্ণতা প্রভৃতি রোগের প্রাবল্য দেখা গেল। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নির্দ্দেশ মত প্রায় ২ মাস যাবৎ 'চিত্তরঞ্জন সেবা-সদনে' দৈনিক রঞ্জনরশ্মি প্রয়োগ সহ অন্যবিধ চিকিৎসা চলিতে থাকিল। ডাঃ সুবোধ বসুর ব্যবস্থা মত প্রায় ৩ মাস যাবৎ শুধু ফল-মূলাদি আহার করিয়া চিকিৎসিত হইলেন। সম্পূর্ণ শারীরিক বিশ্রাম গ্রহণের নির্দ্দেশ ছিল চিকিৎসকদের, কিন্তু সতীন্দ্রনাথ গৃহের মধ্যে কর্ম্মবিহীন হইয়া একেবারে চুপ-চাপ থাকিবেন—ইহা ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কর্ম্মের প্রতি মানসিক আকর্ষণ এত অধিক

ছিল যে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়াও তিনি শেষ পর্য্যন্ত আবার পূর্ণভাবে কার্য্যে লিপ্ত হইলেন। কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতির চিকিৎসাধীনে থাকিবার সময় এমনই এক সংবাদ পাইয়া কবিরাজ মহাশয় বড়বাজার অঞ্চলে সতীন্দ্রনাথের শারীরিক অবস্থা জানিবার জন্য তাঁহার পুত্র শ্রীবিমলানন্দ তর্কতীর্থ মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলেন।

প্রাদেশিক রাজনীতি তিনি বুঝিতেন না—বুঝিবার চেষ্টাও করিতেন না। সোজা ও সরলভাবে তিনি দেখিলেন যে গান্ধী-আরউইন চুক্তির ব্যর্থতা অনিবার্য্য ; সুতরাং পুনরায় সংগ্রাম সুরু হইবে এবং তাহা হইবে কঠোরতম ও দীর্ঘতর। এরূপ অবস্থায় ভবিষ্যৎ সংগ্রামের জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রস্তুতির আয়োজন করাই হইল অতীব আবশ্যকীয় কর্ম্ম। কাজেই এই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হইয়া তিনি নিজেই এমন একটী কর্ম্মব্যবস্থা নির্ব্বাচন করিলেন যাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর কংগ্রেস কর্ম্মীর সহায়তা তিনি পাইতে পারেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি মতে শান্তিপূর্ণ পিকেটিংএর কোন বাধা ছিল না। এই সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনি একটী কর্ম্মসূচী রচনা করিলেন। বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম সহ সমগ্র উত্তর ভারতের বস্ত্রের চাহিদা মিটাইবার একমাত্র বৈদেশিক বস্ত্র আমদানীর কেন্দ্রস্থল হইল কলিকাতা নগরীর বড়বাজার। এই কেন্দ্রস্থলে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের জন্য শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করা হইলে তাহার পরিণতি সর্ব্বদেশে বিশেষভাবে অনুভূত

হইবে। এই কার্য্যের মাধ্যমে বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন ব্যতীত পরোক্ষভাবে যে সেবকবাহিনী গঠিত হইবে, পরবর্ত্তী আন্দোলনের পুরোধারূপে তাহারাই হইবে বিশিষ্ট সংগ্রামী।

কর্ম্মক্ষেত্রে সতীন্দ্রনাথের এই কর্ম্মসূচী প্রয়োগ করিবার প্রধানতম সহযোগী ছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার বসু। তাঁহার ন্যায় ত্যাগী, আত্মভোলা, অক্লান্ত কর্ম্মীর সহায়তায় কংগ্রেসের বিবাদমান উভয় পক্ষের পূর্ণ সম্মতি ও সহযোগিতা গ্রহণ করিয়া 'এলবার্ট হলের' কমিটি-রূমে অনুষ্ঠিত এক সভায় একটি সংস্থা গঠিত হইল—'কংগ্রেস পিকেটীং বোর্ড'। ইহার যুগ্ম-সম্পাদক হইলেন সতীন্দ্রনাথ ও হেমন্ত কুমার। এই কর্ম্মে অগ্রণী হইলেন শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীমতী বিমল প্রতিভা দেবী, শ্রীমতী সরোজিনী দেবী প্রভৃতি বহু বিশিষ্টা মহিলাবৃন্দ এবং শ্রীসীতারাম সাকসেরীয়া, বসন্তলাল মুরারকা, শ্রী জে, এম, দাশগুপ্ত, শ্রীমাখমলাল সেন, প্রোঃ আবদার রহিম, শ্রী জে, এম, দত্ত, শ্রীপ্রভাত গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীরামকুমার ভূয়ালকা, মদনমোহন বর্ম্মন প্রভৃতি বহু কংগ্রেস কর্ম্মীগণ।

বড়বাজারের হ্যারিসন রোডের উপর অবস্থিত একটী প্রশস্ত গৃহে স্থাপিত ছিল একটী সংস্থা—'বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার সমিতির' অফিস। টেলিফোন, আসবাবপত্রে সজ্জিত অফিস দৃষ্টে সতীন্দ্রনাথ আশা করিলেন উক্ত অফিস হইতেই পিকেটীংএর কার্য্য পরিচালনা করা হইবে সহজে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাব তাহাদের নিকট উপস্থাপিত করিবামাত্রই আসিল তীব্র বাধা।

অজানা কারণে সতীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইলেন। পরে প্রকাশিত হইল যে বড়বাজার অঞ্চলের বহু বিশিষ্ট বিশিষ্ট বস্ত্র ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যেই এই সুসজ্জিত সংস্থাটী পরিচালিত হইয়া থাকে। বাহিরে প্রকাশ থাকিবে যে এরূপ একটী বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন আন্দোলনের সংস্থা যখন সে অঞ্চলে রহিয়াছেই তখন সে স্থানে অন্য প্রকারের আন্দোলন সৃষ্টি করিবার আবশ্যক কোথায়? কাজেই কংগ্রেস পক্ষ হইতে বর্জ্জন আন্দোলনের জন্য পৃথক ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে না।

সতীন্দ্রনাথ ছিলেন ঘোর-প্যাঁচহীন সরল স্পষ্ট কর্ম্মী। নির্ভয়েই তিনি কর্ম্মে অগ্রসর হইলেন। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ চটিবেন কি চটিবেন না,—এ চিন্তা তাঁহার ছিল না। তাহাদের দেয় অর্থ না হইলে তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বিপন্ন হইবে এ দুর্ভাবনাও তাঁহার ছিল না।

প্রায় শতাধিক নির্ব্বাচিত কর্ম্মীসহ প্রত্যহ পিকেটীং কার্য্য সুরু হইল। সমগ্র দিবস বড়বাজার অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া সতীন্দ্রনাথ এই কার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন। সতীন্দ্রনাথ যখন কর্ম্ম সুরু করিয়াছেন তখন পুলিস পক্ষ যে সেস্থানে উপস্থিত হইবে—ইহা ছিল অবধারিত কথা। সুতরাং, কলিকাতার পুলিস-সার্জ্জেণ্টদের এক বৃহৎ বাহিনী বড়বাজার অঞ্চলে মোতায়ন করা হইল। ইহার ফলে যেমন বর্জ্জন আন্দোলন বিশেষ ভাবে কার্য্যকরী হইল, তেমনি ব্যবসায়ী মহলেও বিশেষ এক আতঙ্ক বৃদ্ধি পাইল।

তখন পুলিস কমিশনার ছিলেন মিঃ কোলসন। তিনি পূর্ব্বে ছিলেন বরিশালে। সতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য খর্ব করিবার প্রয়াসে তাঁহাকে পুনরায় আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করা হইল। ১১০ ধারার জামীননামা নাকচ করিবার জন্য প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে আবেদন করা হইল। মিঃ জে, সি, গুপ্তের সহযোগে মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জীও এবার সতীন্দ্রনাথের পক্ষাবলম্বন করিলেন। পুলিসপ্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল।

* * * *

কান্দী সম্মেলনে সভাপতিত্ব—১৯৩১

মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস সম্মেলন কান্দী মহকুমা সহরে অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন সতীন্দ্রনাথ। তিনি সভাপতিরূপে বাংলাদেশের বিপ্লবীদের অহিংসা গ্রহণের জন্য আবেদন করেন। অহিংস নীতির উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থার কথা এই সভাতেই জনসমক্ষে সর্ব্বপ্রথম ব্যক্ত করা হইল।

* * * *

হিজলী বন্দীনিবাসে গুলীবর্ষণ

১৯৩১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে হিজলী বন্দী নিবাসে গুলী-বর্ষণের সংবাদে সমগ্র দেশে দারুণ উদ্বেগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই দুর্ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া দেশে প্রতিবাদ আন্দো-লন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের বিবাদমান উভয় পক্ষের সম্মিলিত যুক্ত কর্ম্ম গ্রহণের জন্য সতীন্দ্রনাথ বিশেষ ভাবে উদ্যোগী হইলেন। জে, এম, সেনগুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের

সাহুকুল্যে এবং সতীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রচেষ্টায় টাউন-হলে জনসভা আহুত হয় এবং লোক-প্রাচুর্য্য হেতু স্থান পরিবর্ত্তিত হইয়া মনুমেণ্টের নীচে সভা হয় যাহাতে রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন। সুভাষচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে কিরণশঙ্কর রায় প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের মুখপাত্র হইয়া সতীন্দ্রনাথ জে, এম, সেনগুপ্ত, সুরেশ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া সম্মিলিত কার্য্যসূচী রচনা করেন এবং এই কর্ম্মে দল-নিরপেক্ষভাবে কার্য্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সুভাষচন্দ্র তখন জামসেদপুরে শ্রমিক আন্দোলনে ছিলেন ব্যস্ত। এই গুলীবর্ষণের প্রতিবাদ-আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য সতীন্দ্রনাথ জামসেদপুর উপস্থিত হইয়া সুভাষচন্দ্রকে অনুরোধ করেন এবং উভয়ে একত্রে কলিকাতা আগমন করেন।

এই গুলীবর্ষণের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে কমিটী সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হয় উহার সম্মুখে কংগ্রেস পক্ষে মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জী উপস্থিত হইয়াছিলেন বিশেষভাবে সতীন্দ্রনাথেরই অনুরোধে।

* * * *

সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে

১৯৩১ সনের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই সহরে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধিবেশন। সুভাষচন্দ্রের সহিত সতীন্দ্রনাথ উক্ত অধিবেশনে যোগদান করেন এবং পরে উভয়েই একত্রে কলিকাতা যাত্রা করেন। কিন্তু

যাত্রাপথের মধ্যেই কল্যাণ ষ্টেশনে সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার করা হয় "রেগুলেশন থ্রী" আইন বলে।

সুভাষচন্দ্র ও সতীন্দ্রনাথের মধ্যে উভয়ের প্রতি উভয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল। উভয়েই ছিলেন সরল, স্পষ্ট ও আদর্শবাদী। এই যাতায়াতের দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সুভাষচন্দ্র তাঁহার নিকট নিজ অন্তরের ভাষা প্রকাশ করেন সরলভাবে। সুভাষচন্দ্রের নিতান্তই ইচ্ছা যে তাঁহার উডবার্ণ পার্কের প্রাসাদোপম গৃহ পরিত্যাগ করিয়া টালীগঞ্জের সন্নিকটে একটী গৃহ নির্ব্বাচন করিয়া কর্ম্মীদের সহিত সাধারণ জীবনযাত্রা সুরু করেন। সুভাষচন্দ্র বলিলেন অনেকেই ভাবে—'তিনি ধনী—বড় লোকের মতন বাড়ীতেই থাকেন, অতএব তিনি কি কখনও প্রকৃত ত্যাগী কর্ম্মীর মনোভাব বুঝিতে পারেন—। এই প্রকারের নির্ম্মম সমালোচনা তাঁহাকে ব্যথিত করিত। সুতরাং তাঁহার ত্যাগব্রতী অন্তরের বাহ্যিক প্রকাশ করিবার ইচ্ছা ছিল যে সকল কর্ম্মীর ন্যায় তিনিও একই ভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম। এই আশা পরিপূর্ণ করিবার সুযোগ আর তিনি পাইলেন না।

*　　*　　*　　*

গান্ধী আরউইন চুক্তি ভঙ্গের পর

সতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় পৌঁছিতেই ১৯৩২ সনের আইন অমান্য সুরু হইল। এই জন্য পিকেটীং বোর্ডের কর্ম্মীগণ পূর্ব্ব হইতেই ছিলেন প্রস্তুত। সুতরাং যে কোন মুহূর্ত্তেই সতীন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হইতে পারেন এই আশঙ্কায় তাঁহার সহকর্ম্মীদের

আবশ্যকীয় কর্ম্মের ব্যবস্থাদি তিনি করিয়াছিলেন। ইহারই অনতিবিলম্বে ১৯৩২ সনের দ্বিতীয় সপ্তাহে সতীন্দ্রনাথকে B. C. L. A. Act. অনুযায়ী গ্রেপ্তার করা হইল। গ্রেপ্তার করিয়া অন্য কোন জেলে না রাখিয়া একেবারে দার্জিলিং জেলে একাকী বাসের জন্য প্রেরণ করা হইল।

পূর্ব্ব হইতেই যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল যে এই দ্বিতীয়-বারের আইন-অমান্য আন্দোলনে সরকার পক্ষ হইতে দমন ব্যবস্থা হইবে কঠোরতম, এই ক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল। বলিতে গেলে, ১৯৩২ সনের আইন অমান্যের প্রারম্ভের মুখে এই পিকেটিং বোর্ডের কর্ম্মীগণই বিশেষ উল্লেখযোগ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন। এই সংস্থার পরিচালনায়ই ন্যূনপক্ষে প্রায় দুই সহস্র কর্ম্মী কারাবরণ করেন। এই কর্ম্মে সতীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট সহকর্ম্মীদের মধ্যে প্রসূন দাশগুপ্ত, ৺সুধীর দাশগুপ্ত, আশু মুখার্জ্জী, নির্ম্মল বসু, ৺রবী রায়, মনি দত্ত, ৺ইন্দু গুহ, মনীন্দ্র সোমদ্দার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা চলে।

বিনা বিচারে আটক

(১৯৩২-১৯৩৭)

বাংলা দেশের বিপ্লবী আটক বন্দীদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত একশত বন্দীকে সর্ব্বপ্রথম প্রেরণ করা হইল দেউলী বন্দী শিবিরে ১৯৩২ সনের জুন-জুলাই মাসে। উক্ত শিবির রাজপুতানার আজমীঢ়-মাড়ওবারের অন্তর্গত দেউলীতে স্থাপিত হইয়াছিল। নসিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট হইতে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত এই স্থান। উক্ত পথের মধ্যে অবস্থিত ছিল 'বনাস' নদী। সুতরাং বাহিরের সহিত দেউলীর যোগাযোগের আয়োজন—যান-বাহন, বাসস্থান বা আহার্য্যাদির কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কাজেই-বন্দীদের সহিত তাহাদের আত্মীয়-পরিজনের দেখা সাক্ষাতের পথ ছিল এক প্রকার অবরুদ্ধ। একশত বন্দীর জন্য প্রথম নম্বর শিবির স্থাপনের পর, ক্রমশঃ চারিটি শিবির স্থাপন করিয়া আরো চারিশত বন্দীদের আনয়ন করা হয়।

দার্জ্জিলিং জেল হইতে সতীন্দ্রনাথকে আনয়ন করা হয় এই স্থানে ১৯৩২ সনের জুন মাসে। অবস্থা দৃষ্টে তিনি চমৎকৃত হইলেন। এই সময় ছিল গ্রীষ্মকাল। দিনের তাপমাত্রা ছিল ১১৮-১২২ ডিগ্রী। যেমন অসহ্য গরম, তেমনি ছিল জলের

অপ্রচুরতা। পান করিবার যদিও বা অল্প একটু জল পাওয়া যাইত, কিন্তু স্নানের জলের ছিল নিতান্তই অভাব। একটা কূপের জল অচিরেই নিঃশেষিত হইয়া গেল। আহার্য্য দ্রব্যাদি প্রত্যহ আনিতে হয় সেই ৭৫ মাইল দূরবর্ত্তী নসিরাবাদ হইতে বা তাহারও দূরবর্ত্তী আজমীঢ় হইতে। ইহার উপর ছিল চিকিৎসা বিভ্রাট। না ছিল হাসপাতাল, না ছিল উপযুক্ত চিকিৎসক।

এই প্রকারের অবস্থার মধ্যে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী-জীবন যাপন করিবার কথা ভাবিতেও মন চঞ্চল ও বিচলিত হইয়া উঠে। সুতরাং চতুর্দ্দিকে মানসিক অবসাদ আসিবার ব্যবস্থাই ছিল। ইহারই ফলে একদিন রাত্রে রাজবন্দী মৃণাল-কান্তি ঘোষ গলায় রজ্জুবদ্ধ করিয়া আত্মহত্যা করিলেন। আতঙ্ক ও বিভীষিকা চতুর্দ্দিক পূর্ণ করিল।

স্বভাবতই এই প্রকারের অবস্থায় সতীন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট থাকেন না। বন্দীদের অতীব প্রয়োজনীয় অভাব অভিযোগ দূর করিবার মানসে শিবির কর্ত্তৃপক্ষের সহিত তাঁহার সুরু হইল আলোচনা ও পরিণামে সংঘর্ষ। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কোন প্রকার বিবাদে লিপ্ত হইতে অনেকেই ছিলেন অনিচ্ছুক। কিন্তু সতীন্দ্রনাথ নিজের উপর বিশেষ ঝুঁকি লইয়াই অগ্রসর হইলেন। এই প্রকারের পরিস্থিতিতে একদিন বিশেষ ভাবে অসুস্থ বন্দী শ্রীনগেন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর চিকিৎসার ব্যাপার লইয়া কর্ত্তৃপক্ষের সহিত সতীন্দ্র-নাথের বাধিল কঠিন সংঘাত। অবস্থার পরিণতি গুরুতর আকারে যে কোন সময়েই ধারণ করিতে পারে—এরূপ

পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। চতুর শিবির-কর্ত্তৃপক্ষ মীমাংসার ছল করিয়া সতীন্দ্রনাথকে অফিসে আহ্বান করতঃ পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

* * * *

পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলে :

১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলে পৌঁছিলেন। এখানে কতিপয় মাস থাকিবার পর পুনরায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল ক্যাম্বেলপুর জেলে। ওখানকার আব-হাওয়া তাঁহার শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হওয়ায় অনতি-বিলম্বেই তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন প্লুরেসী, উরুদ্বয়ের অসাড়তা, ও হাড়ের টি, বি, রোগের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সহিত নূতন উপসর্গ দেখা দিল টনসীল ও ফ্রেন্‌জাই-টিস্। দীর্ঘকাল স্থানীয় চিকিৎসায় সুবিধা না হওয়ায় অবশেষে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে।

কতিপয় মাস এখানে চিকিৎসিত হইবার পর পুনরায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল আম্বালা জেলে।

* * * *

আম্বালা জেলের গৃহদাহ মামলা :

১৯৩৫ সনের শেষের দিকে সতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন আম্বালা জেলে। এই জেলের ব্যবস্থাদি ছিল অন্যান্য স্থান হইতে বিশেষ নিকৃষ্ট। সুতরাং প্রথমাবধিই এই সব বিষয় লইয়া জেলের সুপার খান বাহাদুর মিঃ মহম্মদ রেজার সহিত তাঁহার

বাদবিসম্বাদ সুরু হইল। মিঃ রেজা ছিলেন মেজাজী ও দাম্ভিক প্রকৃতির। তিনি বিশ্বাসই করিতে পারেন না একজন বন্দী দুর্নিবার সাহসে জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করিতে পারে। গর্ব্বের সহিত তিনি উল্লেখ করিলেন যে বড় বড় নামকরা নেতাদের তিনি আটক রাখিয়াছেন, কাজেই বাংলাদেশের একজন সাধারণ বন্দীকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না।

এখানে আসিবার পর সতীন্দ্রনাথের শরীর পুনরায় বেশ খারাপ হইল। এখানকার চিকিৎসার অব্যবস্থা—থাকিবার স্থানের অপ্রচুরতা, আহার্য্যাদি বিষয়ে নানাবিধ অসুবিধার প্রতি জেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করিয়াও তিনি ব্যর্থ হইলেন। বাধ্য হইয়া ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জেল সুপার উক্ত পত্র চাপা দিলেন। কতিপয় সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া পুনঃ পুনঃ স্মারক পত্র প্রেরণ করিলেন তিনি, উহাও আটক করা হইল। সতীন্দ্রনাথের অগোচরেই উহা করা হইতেছিল। যখন এই সংবাদ প্রকাশ পাইল তখন ক্ষুব্ধ সতীন্দ্রনাথের সহিত সুপারের বাধিল দারুণ সংঘর্ষ। খোলাখুলি ভাবে সুপার জানাইলেন যে সতীন্দ্র-নাথের কোন পত্র ঊর্দ্ধতন অফিসে প্রেরণ করা হইবে না।

দাম্ভিক সুপারের হুমকিতে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন—এরূপ দুর্ব্বল চিত্ত সতীন্দ্রনাথের ছিল না। দেশের অপর প্রান্তে অবস্থিত কারাগারে একেলা নিজের আত্মসম্মান, স্বাস্থ্য ও ন্যায্য অধিকার রক্ষার্থে দণ্ডায়মান হওয়া ছিল নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুতর ব্যাপার।

পরিস্থিতির উদ্ভব হইল। চতুর শিবির-কর্ত্তৃপক্ষ মীমাংসার ছল করিয়া সতীন্দ্রনাথকে অফিসে আহ্বান করতঃ পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলে প্রেরণের ব্যবস্থা করিলেন।

* * * *

পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলে :

১৯৩২ সনের ডিসেম্বর মাসে তিনি পাঞ্জাবের গুজরানওয়ালা জেলে পৌঁছিলেন। এখানে কতিপয় মাস থাকিবার পর পুনরায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল ক্যাম্বেলপুর জেলে। ওখানকার আব-হাওয়া তাঁহার শরীরের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হওয়ায় অনতি-বিলম্বেই তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন। তাঁহার পূর্ব্বতন প্লুরেসী, উরুদ্বয়ের অসাড়তা, ও হাড়ের টি, বি, রোগের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতির সহিত নূতন উপসর্গ দেখা দিল টনসীল ও ফ্রেন্জাই-টিস্। দীর্ঘকাল স্থানীয় চিকিৎসায় সুবিধা না হওয়ায় অবশেষে তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল লাহোরের মেয়ো হাসপাতালে।

কতিপয় মাস এখানে চিকিৎসিত হইবার পর পুনরায় তাঁহাকে প্রেরণ করা হইল আম্বালা জেলে।

* * * *

আম্বালা জেলের গৃহদাহ মামলা :

১৯৩৫ সনের শেষের দিকে সতীন্দ্রনাথ উপস্থিত হইলেন আম্বালা জেলে। এই জেলের ব্যবস্থাদি ছিল অন্যান্য স্থান হইতে বিশেষ নিকৃষ্ট। সুতরাং প্রথমাবধিই এই সব বিষয় লইয়া জেলের সুপার খান বাহাদুর মিঃ মহম্মদ রেজার সহিত তাঁহার

বাদবিসম্বাদ সুরু হইল। মিঃ রেজা ছিলেন মেজাজী ও দাম্ভিক প্রকৃতির। তিনি বিশ্বাসই করিতে পারেন না একজন বন্দী দুর্নিবার সাহসে জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাবী উত্থাপন করিতে পারে। গর্ব্বের সহিত তিনি উল্লেখ করিলেন যে বড় বড় নামকরা নেতাদের তিনি আটক রাখিয়াছেন, কাজেই বাংলাদেশের একজন সাধারণ বন্দীকে তিনি গ্রাহ্যই করেন না।

এখানে আসিবার পর সতীন্দ্রনাথের শরীর পুনরায় বেশ খারাপ হইল। এখানকার চিকিৎসার অব্যবস্থা—থাকিবার স্থানের অপ্রচুরতা, আহার্য্যাদি বিষয়ে নানাবিধ অসুবিধার প্রতি জেল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করিয়াও তিনি ব্যর্থ হইলেন। বাধ্য হইয়া ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উক্ত বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি পত্র প্রেরণ করিলেন। কিন্তু জেল সুপার উক্ত পত্র চাপা দিলেন। কতিপয় সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়া পুনঃ পুনঃ স্মারক পত্র প্রেরণ করিলেন তিনি, উহাও আটক করা হইল। সতীন্দ্রনাথের অগোচরেই উহা করা হইতেছিল। যখন এই সংবাদ প্রকাশ পাইল তখন ক্ষুব্ধ সতীন্দ্রনাথের সহিত সুপারের বাধিল দারুণ সংঘর্ষ। খোলাখুলি ভাবে সুপার জানাইলেন যে সতীন্দ্র-নাথের কোন পত্র ঊর্দ্ধতন অফিসে প্রেরণ করা হইবে না।

দাম্ভিক সুপারের হুমকিতে তিনি নিশ্চেষ্ট থাকিবেন—এরূপ দুর্ব্বল চিত্ত সতীন্দ্রনাথের ছিল না। দেশের অপর প্রান্তে অবস্থিত কারাগারে একেলা নিজের আত্মসম্মান, স্বাস্থ্য ও ন্যায্য অধিকার রক্ষার্থে দণ্ডায়মান হওয়া ছিল নিঃসন্দেহে বিশেষ গুরুতর ব্যাপার।

কিন্তু অন্যায়ের সম্মুখে জীবনে কখনও যিনি মস্তক নত করেন নাই—এখানেও তিনি মাথা নোয়াইলেন না।

এবার জেল সুপারকে চরম পত্র দিয়া জানাইলেন যে এই সব বে-আইনী কার্য্য বন্ধ না করিলে তিনি গুরুতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইবেন। ইহাও উপেক্ষিত হইল। পরবর্ত্তী পত্রে তিনি জানাইলেন যে জেল সুপারের কার্য্যাবলীর প্রতিবাদে ঊর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট দিনে এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে জেলের অভ্যন্তরস্থ পৃথকাংশে অবস্থিত পরিত্যক্ত একটী ক্ষুদ্র গৃহে তিনি অগ্নি প্রদান করিবেন। ইহার ফলে যে মামলা দায়ের হইবে উহারই মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হইবে জেল সুপারের কার্য্যাবলী। যেমন কথা কার্য্যও তেমনি হইল। নির্দ্দিষ্ট দিনে অগ্নি প্রদান করিতেই পাগলা ঘুন্টি বাজিয়া গেল। মহা উৎসাহে জেল সুপার সতীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অগ্নিদাহের মামলা আনয়ন করিলেন।

জেলের অভ্যন্তরেই মামলা চলিল। মামলা দৃষ্টে বিচারক চমকিত হইলেন। কোন ব্যবহারজীবী সতীন্দ্রনাথের পক্ষে ছিল না। বাহিরের সহিত সংযোগ একপ্রকার ছিল না বলিলেই চলিত। প্রথমাবধি সতীন্দ্রনাথ নিজেই মামলা পরিচালনা করিলেন। কিন্তু কয়েক মাস পরে বাহিরে সংবাদ পৌঁছিবার পর পঞ্জাব কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষ লালা টেকচাঁদ ও লালা শ্যামলাল ব্যারিষ্টার দ্বয়কে প্রেরণ করেন মামলা পরিচালনার জন্য। সানন্দে তাঁহারা অগ্রণী হইলেন।

এই মামলা চলিতে থাকাকালীন পাঞ্জাব হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Douglas Young উক্ত জেল-ভ্রমণে আসিয়া সতীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় এই অদ্ভুত মামলার বিষয় শুনিয়া বিস্মিত হইলেন—এবং নিশ্চয় কোথায়ও কোন গলদ রহিয়াছে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন।

বৎসরাধিককাল এই মামলা চলিবার পর প্রাদেশিক মন্ত্রী লালা মনোহর লালের দৃষ্টি এই ঘটনার প্রতি আকৃষ্ট হইল। মামলার বিষয়বস্তুর দুর্ব্বলতা দৃষ্টে ও লালা মনোহর লালের হস্ত-ক্ষেপের ফলে ১৯৩৭ সনের জুলাই মাসে উক্ত মামলা প্রত্যাহৃত হইল। ইহারই পূর্ব্বে জেল সুপার মিঃ রেজাকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা হইল।

* * * *

মুক্তিলাভ

এই মামলা প্রত্যাহৃত হইবার পরেই আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সতীন্দ্রনাথকে পুনরায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্সী জেলে প্রেরণ করা হয়। এই স্থানে পৌঁছিবার অনতিবিলম্বেই তাঁহাকে বীরভূম জেলার মৌরেশ্বর থানায় অন্তরীণের আদেশ প্রদান করা হয়। কতিপয় মাস পর ১৯৩৭ সনের ডিসেম্বর মাসে পূর্ণ ছয় বৎসর আটক-বন্দী থাকিবার পর তাঁহাকে মুক্তি প্রদান করা হইল।

পুনরায় কর্ম্মযজ্ঞে

দীর্ঘ দিবস আটকাবস্থা হইতে মুক্তিলাভ করিবার পর বাংলা কংগ্রেসের নেতা সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে সতীন্দ্রনাথ কংগ্রেস কর্ত্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের সাহায্য সমিতির কার্য্যভার গ্রহণ করেন। বিশেষ আগ্রহ ও উদ্যমের সহিত উক্ত কার্য্যে তিনি আত্মনিয়োগ করেন।

এই কার্য্য করিতে করিতে নূতন সমস্যা দেখা দিল। তখনও কয়েক শত রাজবন্দীদের মুক্তিদানে ইতস্ততঃ করা হইতেছিল। সুতরাং এই বিষয়েও সতীন্দ্রনাথ বিশেষ তৎপর হইলেন। এই বিষয়টীকে তিনি গান্ধীজীর সমীপে নিবেদন করিয়া জানাইলেন যে ইহার প্রতিবিধান যদি না করা হয় তবে বাংলা দেশ হইতে রাজবন্দীদের জন্য এক প্রবল মুক্তি-আন্দোলন সৃষ্টি করা হইবে। অবশ্য গান্ধীজী প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে তিনি নিজেই এই বিষয়ে উদ্যোগী হইতেছেন।

শেষে গান্ধীজীর প্রচেষ্টায়ই সমুদয় রাজবন্দীদের মুক্তিলাভ ঘটে।

* * * *

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস-সভাপতিত্ব ত্যাগ

সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন ও

পরে কংগ্রেসের পূর্ব্বতন নেতৃবৃন্দের সমবেত ভাবে পদত্যাগকে কেন্দ্র করিয়া কলিকাতায় ওয়েলিংটনস্কোয়ারে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন সেদিন সমগ্র দেশে এক বিপুল উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করিতেছিল। এ হেন পরিবেশে সুভাষচন্দ্রের সহিত গান্ধীজীর কোন প্রকার আপোষ হয়—ইহাই ছিল সকলের অন্তরের কামনা।

এই প্রকারের অবস্থায় সতীন্দ্রনাথ ৺হরিদাস মজুমদার সহ রবীন্দ্রনাথের নিকট বি, টি, রোডস্থ শ্রীযুক্ত প্রশান্ত মহলানবীশ মহাশয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। মহা আবেগের সহিত সেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে গ্রহণ করিলেন।

সমগ্র বাংলা দেশ ছিল তখন তীব্র গান্ধী-বিরোধী ভাবাপন্ন। এরূপ অবস্থায় অতীব বিস্ময়ের সহিত তাঁহারা শুনিলেন গান্ধীজীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের কী গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বিশেষ আক্ষেপের সহিত রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিলেন বাংলাদেশের ভবিষ্যতের চিত্র। বাঙ্গালী যেন ক্রমশঃ সমগ্র ভারতের নেতৃত্বের আসন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সঙ্কুচিত পরিধির মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

সতীন্দ্রনাথের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের নিকট তারবার্ত্তা প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রথম বারের লিখিত বার্ত্তা কিঞ্চিৎ সংশোধিত আকারে প্রেরিত হইল।

অতঃপর সতীন্দ্রনাথ সাক্ষাৎ করিলেন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র

রায়ের সহিত। তাঁহার দ্বারাও অনুরূপ তারবার্ত্তা প্রেরিত হইল গান্ধীজী ও সুভাষচন্দ্রের নিকট। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতেই হইল।

* * * *

দৈনিক 'কেশরী' পরিচালনা

এই সময়ে বিভিন্ন কার্য্যোপলক্ষে সতীন্দ্রনাথের কলিকাতা বাসের অবসরে ৺হরিদাস মজুমদার মহাশয় তাঁহার পরিচালিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র 'কেশরী' পত্রিকার সম্পূর্ণ পরিচালনা ও কর্ত্তৃত্বের ভার তাঁহার উপর অর্পণ করেন। কার্য্যক্ষেত্রে সতীন্দ্রনাথের উক্ত পত্রিকার পরিচালনায় সাহার্য্য করেন তাঁহার তরুণ সহকর্মী বিনয় সেন, আশু মুখার্জী, শ্রীনৃপেন্দ্র সেন, প্রসূন দাশগুপ্ত, কৃষ্ণ চ্যাট্যার্জ্জী ও দীনেশ সেন প্রভৃতি সহকর্ম্মীগণ। কিন্তু অর্থাভাব অনভিজ্ঞতা ও পরিচালনার ক্রটির জন্য কতিপয় মাসের পরেই উক্ত পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হইয়া যায়।

এই ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে ৺হরিদাস মজুমদার সতীন্দ্রনাথকে এতদূর স্নেহ ও প্রীতির চক্ষে দেখিতেন যে উক্ত পত্রিকাখানা ব্যতীত সতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার সহকর্মীদের কলিকাতায় বসবাস করিবার জন্য ১০৪ নং কলিন ষ্ট্রীটের একটী পৃথক ফ্লাট বাড়ী বিনা ভাড়ায় বহু বৎসরের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

* * * *

সহকর্ম্মীদের সহিত আদর্শের পার্থক্য

দীর্ঘকাল আটকাবস্থায় থাকিবার ফলে সতীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট

সহকর্ম্মীদের মধ্যে আদর্শগত মতভেদ দেখা গেল। পূর্ব্বতন সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী মনোভাবের পরিবর্ত্তে সমাজতান্ত্রিক শ্রেণী-দ্বন্দ্বের ভাবধারা যেমন একশ্রেণীর কর্ম্মীদের আকৃষ্ট করিল, তেমনি গান্ধী-বাদের বেগবান কর্ম্মাদর্শ আর এক শ্রেণীর কর্ম্মীদের কর্ম্মের প্রেরণা দিল। ফলে হীরালাল দাশগুপ্ত, নৃপেন সেন, সুকুমার সেন প্রভৃতির নেতৃত্বে সতীন্দ্রনাথের কতিপয় সহকর্ম্মী ক্রমশঃ কম্যুনিষ্ট দলে যোগদান করিলেন। অপর একদল কর্ম্মী, নির্ম্মল ঘোষ, কেদার সোমদ্দার, দেবেন দত্ত, কিরণ রায় চৌধুরী প্রভৃতির প্রেরণায় গান্ধীবাদের গঠনমূলক কর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। ইহা ব্যতীত বহু সংখ্যক কর্ম্মী ছিলেন মধ্যপন্থীয় ভাবধারায় আকৃষ্ট, অর্থাৎ সতীন্দ্রনাথের সহিত কংগ্রেসের যাবতীয় কর্ম্মের অনুরাগী।

*   *   *   *

একক সত্যাগ্রহী—ভোলা মহকুমার আর্ত্তত্রাণ

ভারতবর্ষের জনসাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ১৯৩৯ সনের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য করিল। ইহার প্রতিবাদে মহাত্মাজী অহিংসভাবে যুদ্ধবিরোধী প্রচারের জন্য উদ্ভাবন করিলেন এক চমকপ্রদ ব্যবস্থা। নৈতিক ভিত্তিতে এই যুদ্ধে বিরোধিতা করিবার জন্য আয়োজন করা হইল 'একক সত্যাগ্রহী' ও তাহাদের একটি দল।

একক সত্যাগ্রহীরূপে সতীন্দ্রনাথ নির্ব্বাচিত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বরিশাল জিলার ভোলা মহকুমায় এক বিষম প্লাবন

সংঘটিত হইল। শত শত লোকের প্রাণহানি হইল, সহস্র সহস্র গবাদি পশু প্লাবনের বেগে ভাসিয়া গেল—অবশেষে মহামারী ও ছুর্ভিক্ষের আবির্ভাব হইল। এই সংবাদে মহাত্মাজী সতীন্দ্রনাথকে সত্যাগ্রহ করিতে নিষেধ করিয়া সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উপদেশ দেন।

মুষ্টিমেয় কতিপয় ঘর হিন্দু ব্যতীত প্রায় সমুদয় জনসমষ্টিই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের। সুতরাং তাহাদের এই নিদারুণ বিপর্য্যয়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন সতীন্দ্রনাথ। ব্যক্তিগত চাঁদা সংগ্রহ দ্বারা উহার কোনই প্রতিকার সম্ভব নয়—আবশ্যক সরকারী অর্থের ব্যাপক প্রয়োগ। অনিচ্ছুক সরকারী কর্ম্মচারী-গণের বাধা অতিক্রম করা ছিল দুরূহ কার্য্য। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের দৃঢ়তা, একগুঁয়েমী, অনলস প্রচেষ্টা ও কর্ম্মকুশলতা শেষ পর্য্যন্ত বিশেষ ফলপ্রসূ হইল। সরকার হইতে আবশ্যকীয় বহু লক্ষ টাকা ব্যয় করান সম্ভব হইল। তবে অর্থ ব্যয়ের উপর সতীন্দ্রনাথের সতর্ক ও জাগ্রত দৃষ্টি থাকিবার দরুণ জনসাধারণের মধ্যে সতীন্দ্র-নাথের প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এই কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবার অবসরে সতীন্দ্রনাথ আর একটী স্থায়ী বৃহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করেন। বরিশালের প্রসিদ্ধ 'সাতলার বিল' কচুড়ী দলে আবদ্ধ থাকিয়া স্থানীয় কৃষকদের দুর্ভাগ্যের কারণ হইত। সতীন্দ্রনাথের উদ্যোগে সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার ফলে উক্ত বিল পরিষ্কৃত ও উন্মুক্ত করা হইল এবং কৃষকদের মধ্যে এক নবজীবনের সূচনা হইল।

যুদ্ধের চাঁদা সংগ্রহের বিরুদ্ধে—১৯৪০-৪২ঃ

যুদ্ধে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য সরকারী পক্ষ হইতে প্রবল প্রচার কার্য্য চলিতেছিল। বাহ্যত আবেদন ছিল স্বেচ্ছা-প্রণোদিত অর্থদান করিবার জন্য। কিন্তু অত্যুৎসাহী সরকারী কর্ম্মচারিগণ পুলিস ও স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের সহায়তায় জুলুম জবরদস্তি সহ অর্থ সংগ্রহ চালাইতেছিল। অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত জনসাধারণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া সাধ্যের অতীত অর্থ দান করিতে বাধ্য হইতেছিল।

এই প্রকারের সংবাদ সতীন্দ্রনাথের নিকট পৌঁছিতেই তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জাগ্রত হইল উহার প্রতিরোধ করিবার জন্য। সুতরাং অগৌণে তিনি সাক্ষাৎ করিলেন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, বি, লিউলিনের সহিত এবং এই জুলুম আদায় বন্ধ করিবার দাবী করিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরে জানাইলেন যে স্বেচ্ছায় সকলে চাঁদা দিতেছে। অগত্যা সতীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত জনগণের মনে সাহস ও আস্থার ভাব আনয়ন করিয়া বিস্তারিত জুলুম আদায়ের সংবাদ সংগ্রহ করিলেন, এবং প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা অভ্রান্তভাবে উহার সত্যতা উদঘাটন করিয়া সতীন্দ্রনাথ দাবী করিলেন—"এই জুলুম আদায়ী অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।" জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এতটা আশা করেন নাই। কাজেই এবার হইলেন নিরুত্তর—অনিচ্ছাকৃত যুদ্ধের চাঁদা গ্রহণ করিবার তো আর বিধি নাই! নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত অতিরিক্ত আদায়ী অর্থ প্রত্যর্পণ করিতে

বাধ্য হইলেন। বোধ করি সমগ্র ভারতবর্ষে যুদ্ধের চাঁদা একবার আদায় হইয়া পুনরায় উহা প্রত্যর্পিত হইয়াছে—এই ঘটনা ব্যতীত এরূপ নজীর পাওয়া আর যাইবে না।

সতীন্দ্রনাথের এই প্রকারের দুঃসাহসিক কার্য্যের দরুণ স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষভাবে ক্রুদ্ধ হইলেন। অচিরেই কৌশল করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল ভারতরক্ষা আইন বলে। বিচারে দণ্ড হইল ৩ মাস সশ্রম কারাবাস। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য তখন অনেকাংশেই সফলী-কৃত।

* * * *

ভারত রক্ষা আইনে আটক-বন্দী

১৯৪২ সনের আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সতীন্দ্রনাথ আসিয়াছেন কলিকাতায়। ইতিমধ্যে বোম্বাই সহরে ভারত রাষ্ট্রীয় অধিবেশনে গান্ধীজীর ঐতিহাসিক দাবী 'ভারত ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার পরবর্ত্তী ইতিহাস—বৃটীশ বজ্রমুষ্টি পতিত হইল দেশের যাবতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের উপর। গান্ধীজী, নেহরু, আজাদ প্রভৃতি সকল নেতৃবৃন্দকেই গ্রেপ্তার করা হইল।

শ্যামাপ্রসাদ তখন ছিলেন বাংলার মন্ত্রী। তাঁহার নিকট সতীন্দ্রনাথ পূর্ব্বাহ্লেই জানিতে পারিলেন যে বাংলাদেশের প্রথম যাঁহাদের গ্রেপ্তার করিবার নির্দ্দেশ হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে সতীন্দ্রনাথ হইলেন অন্যতম। সুতরাং তিনি প্রস্তুত হইত না হইতেই ১৩ই আগষ্ট প্রাতে তাঁহার বাসস্থান ১০৪নং কলি ষ্ট্রীট

তাঁহাকে ভারতরক্ষা আইন বলে গ্রেপ্তার করা হইল। তিনি প্রেসিডেন্সী জেলে প্রবেশ করিলেন।

প্রেসিডেন্সী জেলে তখন বাংলাদেশের বহু বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের সমাবেশে ছিল পূর্ণ। তন্মধ্যে ছিলেন সতীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীযুত কালীপদ মুখার্জ্জী পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান মন্ত্রী দ্বয়।

১৯৪৩ সনের বাংলাদেশের ঐতিহাসিক দুর্ভিক্ষ সুরু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কারাভ্যন্তরে থাকিয়া স্বচ্ছন্দভাবে দৈনিক বরাদ্দের উৎকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিতে কতিপয় কর্ম্মীর অন্তরে আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ইহারই ফলে সতীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুত প্রফুল্ল সেন মহাশয় কতিপয় উৎসাহী কর্ম্মীসহ ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন পৃথক আহারের। ন্যূনতম আবশ্যকীয় খাদ্য গ্রহণ করিয়া উদ্বৃত্ত খাদ্য বা উহার মূল্য বাহিরে দুর্ভিক্ষের সহায়তার জন্য প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা হইল। এইরূপে উদ্বৃত্ত বস্ত্র সঞ্চয় করিয়াও পাঠান হইত বাহিরে। এই সাহায্যমূলক কার্য্যের জন্য প্রেসিডেন্সী জেলে তাহাদের পাকশালার নামকরণ হইল 'রিলিফ কিচেন'। যতদিন তাহারা কারাভ্যন্তরে ছিলেন এই ব্যবস্থাই ছিল বলবতী।

* * * *

গান্ধীজীর অনশনের সহিত সহ-অনশন :

১৯৪৩ সনে আগা খাঁ প্রাসাদে আবদ্ধ অবস্থায় মহাত্মাজী সুরু করিলেন তাঁহার বিশ্ব বিখ্যাত ২১ দিবসের অনশন। এই

অনশনের সাথে সাথে প্রেসিডেন্সী জেলে থাকিয়া সতীন্দ্রনাথও সহ-অনশন সুরু করেন নিজ আত্মশুদ্ধির কামনায়।

এই ভাবে প্রায় ৩ বৎসর ৪ মাস আটক থাকিয়া ১৯৪৫ সনের নবেম্বর মাসে তিনি প্রসিডেন্সী জেল হইতে মুক্তিলাভ করেন।

* * * *

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন :

১৯৪৫ সনের শেষে জেল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় সতীন্দ্রনাথ বরিশালের কংগ্রেসের পুনর্গঠনের কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। গান্ধীজীর আদর্শানুযায়ী কার্য্যানুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে তিনি বরিশাল জিলার কলসকাঠি গ্রামে একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিলেন—'গান্ধী আশ্রম'। সতীন্দ্রনাথের অনুগামী শ্রীনির্ম্মল ঘোষ, শ্রীকেদার সোমদ্দার শ্রীকিরণ রায় চৌধুরী ও শ্রীবিনোদ কাঞ্জিলাল প্রভৃতি সহকর্ম্মীদের সাহচর্য্যে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইত।

১৯৪৬ সনের অবিভক্ত বাংলাদেশের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেস প্রার্থীরূপে সতীন্দ্রনাথকে দণ্ডায়মান হইবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়—যেহেতু তিনি সাধারণতঃ ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে অনিচ্ছুক থাকিতেন। হিন্দু-তপশীল যুক্ত নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সতীন্দ্রনাথ ১৯৪৬ সনের নির্ব্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্ব্বাচিত হইলেন। সতীন্দ্রনাথ ভোট পাইলেন ৪৮০০০ হাজার এবং শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ২৮০০০ ভোট পাইয়া একই কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইলেন। সতীন্দ্রনাথের প্রতি

ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক রাষ্ট্ররূপে পাকিস্থান সৃষ্টির পূর্ব্বে সমগ্র বাংলাদেশের অভিমত সংগ্রহের ব্যবস্থা চলিতেছিল। সতীন্দ্রনাথ ছিলেন 'পাকিস্থান'-সৃষ্টির ঘোরতর বিরোধী। কিন্তু বরিশালের অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বিবেচনা ছিল অন্য প্রকারের। সুতরাং সতীন্দ্রনাথের অনুপস্থিতির সুযোগে বরিশাল জিলা কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব পাস করা হইল বঙ্গদেশ বিভক্তের সমর্থনে।

অতঃপর কংগ্রেস দলের নির্দ্দেশ অনুসারেই বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব পাস হইয়া যায়।

ভারতের নেতৃবৃন্দের নির্দ্দেশ অনুসারে যখন পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্থান স্বীকৃত হইল—সতীন্দ্রনাথ উক্ত নির্দ্দেশ অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লইলেন।

পাকিস্থানী নাগরিক

পৃথক রাষ্ট্ররূপে পাকিস্থান সৃষ্টির ব্যাপারে পূর্ব্ব বাংলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে এক দারুণ ত্রাস ও বিশৃঙ্খলতার উদ্ভব হইল। অজানা আতঙ্কে লক্ষ লক্ষ অধিবাসীগণ পূর্ব্ববঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে আগমন সুরু করিল। এইরূপ পরিস্থিতিতে সতীন্দ্রনাথ তাহার কঠোর সংকল্প ব্যক্ত করিলেন যে যতক্ষণ একজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক পাকিস্থানে থাকিবেন—তিনিও থাকিবেন।

বংশপরম্পরায় স্থাপিত নিজ ঘরবাড়ী পরিত্যাগ করিয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে অপর দেশে যাত্রা করিবার মধ্যে যে মানসিক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইল—জাতি হিসাবে ইহা ছিল সতীন্দ্রনাথের নিকট নিদারুণ অপমানজনক। সোয়া ক্রোড় সংখ্যালঘুসম্প্রদায় নগণ্য ছিল না—তবু কেন এই প্রকারের পরাজয় স্বীকারের প্রবৃত্তি—তিনি উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না।

এই প্রকারের পরিস্থিতির মধ্যে দুইটী বিষয়ে তিনি বিশেষ ভাবে ক্ষুব্ধ হইলেন। উভয় বঙ্গের সরকারী কর্ম্মচারীদের ইচ্ছামত দেশ ত্যাগ করিবার ব্যবস্থা ছিল একটী। [illegible] বিবেচনায়

এই একটী মাত্র ব্যবস্থার ফলে পূর্ব্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের মানসিক বলের উপর প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া হইল।

দ্বিতীয়ত পূর্ব্ববঙ্গের প্রতি জিলার বিশিষ্ট বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের দেশত্যাগ ছিল অপর গুরুতর ঘটনা। যে সমস্ত নেতৃবৃন্দের প্রতি বিশ্বাস, আস্থা ও ভরসা করিয়া জনসাধারণ চলিত, সঙ্কট কালে দেখা গেল সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই দেশ পরিত্যাগ করিয়া অপর প্রান্তে চলিয়া গেলেন। জনসাধারণের মানসিক বলের উপর ইহাও হইল প্রচণ্ড ভাঙ্গন।

আদর্শবাদীর বিবেচনায় আদর্শ উদ্‌যাপনের উপযুক্ত স্থান হইল পাকিস্থান। জীবনের নূতন সংকল্প তিনি গ্রহণ করিলেন। পাকিস্থানের নাগরিকদের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিলেন—সেখানে হিন্দু বা মুসলমান প্রশ্ন ছিল না—মানবীয় ধর্ম্মের উপযুক্ত বিকাশ অর্জ্জনই হইল তাঁহার কাম্য। যদি এই আদর্শের জন্য জীবনব্যাপী সংগ্রাম করিতেও হয়, [illegible] উহা হইতে বিরত হইবেন না। ক্ষণেকের জন্যও তাহার মনে কোন দুর্ব্বলতার প্রকাশ পাইল না। জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, শিল্পে, কৃষ্টিতে বৈদেশিক বাণিজ্যে দেশকে উন্নত করিতে হইলে প্রয়োজন যে কর্ম্মের বেগ সৃষ্টি তাহা আসিতে পারে একমাত্র গণতন্ত্রের মাধ্যমে। সুতরাং পাকিস্থানে অসাম্প্রদায়িক গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাই হইল সতীন্দ্রনাথের একমাত্র আদর্শ।

পাকিস্থান সৃষ্টির পর উগ্রপন্থী সরকারী কর্ম্মচারীদের অবহেলা, তাচ্ছিল্য বা ইঙ্গিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে পল্লী অঞ্চল

হইতে বিভিন্ন উৎপীড়নের সংবাদ [illegible] পাইতে থাকেন। তখনকার সময়ে সতীন্দ্রনাথের প্রধান কার্য্য ছিল এই ঘটনাবলী সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীর গোচরে আনয়ন করিয়া প্রতিবিধান করা। প্রয়োজনবোধে মুসলীম লীগের নেতৃবৃন্দ সহ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান করা। কায়েদে আজম জিন্নার নির্দ্দেশ ছিল—সংখ্যালঘুদের উপর কোন প্রকার উৎপীড়ন পাকিস্থান কর্ত্তৃপক্ষ সহ্য করিবেন না। সুতরাং উক্ত নির্দ্দেশ অনুসারে কোন নেতৃবৃন্দেরই বাহ্যতঃ এই প্রকারের উৎপীড়ন-মূলক কার্য্যাবলী সমর্থন করা সম্ভবপর হইত না। সুতরাং সতীন্দ্রনাথের দৃঢ়ভাবে সর্ব্বপ্রকার অত্যাচারমূলক কার্য্যের প্রতিকারার্থে অগ্রসর হইতে থাকায় সংখ্যালঘুদের মনে অনেকটা আস্থা আনয়ন করিল। কিন্তু নিম্নস্তরের সরকারী কর্ম্মচারীদের সংযত করা উচ্চস্তরের কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে তখন ছিল অনেকটা আয়ত্ত্বের বাহিরে।

* * * *

মিঃ লিয়াকৎ আলীর সহিত সাক্ষাৎ

পাকিস্থান রাষ্ট্র যখন গঠিত হইয়াছে তখন আর কংগ্রেস কর্ম্মীর যেন বিশেষ কোন কর্ম্ম নাই—এই প্রকারের অবসাদজনক মনোভাব সর্ব্বত্র প্রকাশ পাইতেছিল। কিন্তু বরিশালে সতীন্দ্রনাথের নিকট ছিল উহা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার কর্ম্ম প্রচেষ্টা এখন যেন আরও গভীর ও ব্যাপক হইল। বরিশালের কংগ্রেস অফিস এবং তাঁহার নিজস্ব বাসস্থান (টাউনহলের একটী গৃহ) ছিল সমগ্র বরিশাল জিলার উৎপীড়িত বা লাঞ্ছিত সংখ্যালঘুদের

প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কেন্দ্র। সর্ব্বসময়েই উক্তস্থান সমবেত লোকজনের দ্বারা পূর্ণ থাকিত। সতীন্দ্রনাথের বিশ্বস্ত ও দীর্ঘদিনের সহকর্ম্মীর দল একে একে পাকিস্থান পরিত্যাগ করিলেও নূতন নূতন সহকর্ম্মীর আগমনে উহার কোন অভাব বোধ তিনি করিতেন না। বলিতে গেলে বৃটিশ আমলের কংগ্রেস কার্য্যের উদ্দীপনার তুলনায়, এ সময়েও কোন প্রকারের কম উৎসাহ ছিল না। সতীন্দ্রনাথের উল্লেখযোগ্য এবং অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে বিশেষ সাহস আনয়ন করিত। এই কার্য্যে তাঁহার প্রধান সহকর্ম্মী ছিলেন শ্রীপ্রাণ কুমার সেন, বর্ত্তমানে এম্, এল্, এ।

কিন্তু সতীন্দ্রনাথের এই প্রকারের বেপরোয়া ও দৃঢ়তা বরিশাল কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ছিল অসহনীয়। সুতরাং কূটনৈতিক ভাবে সতীন্দ্রনাথকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব হইতে অপসারণ করিবার বিশেষ চেষ্টা-যত্ন চলিল।

এই পরিবেশে ১৯৪৯ পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লিয়াকৎ আলী আসিলেন বরিশাল পরিদর্শনে। স্থানীয় বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের যে ব্যবস্থা হইল তাহাতে সতীন্দ্রনাথের জন্য মাত্র ৫ মিনিট নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু এই কৌশল ব্যর্থ হইল। মিঃ লিয়াকৎ আলী তাঁহার সহিত আলোচনা করিলেন প্রায় এক ঘণ্টার অধিক।

সংখ্যালঘুদের পক্ষ হইতে মিঃ লিয়াকৎ আলীর নিকট সতীন্দ্রনাথ পেশ করিলেন একটী বিখ্যাত দাবী-পত্র। উক্ত দাবী-পত্রে

পাকিস্থান নেতৃবৃন্দের প্রকাশ্য নির্দ্দেশ এবং বাস্তবে সরকারী কর্ম্মচারীদের বিপরীত কার্য্যাবলী বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করা ছিল। এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হইল যে এই প্রকারে যদি সরকারী কর্ম্মচারীদের আচরণ চলিতে থাকে তবে অগৌণেই পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের উপর প্রবল তাণ্ডব সুরু হওয়াও অসম্ভব ব্যাপার হইবে না।

সতীন্দ্রনাথের নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও দৃঢ়তা দর্শনে চমৎকৃত মিঃ লিয়াকত আলী বলিলেন—"পাকিস্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে নিরাপদে রয়েছেন তাহার বিশেষ প্রমাণ হলো সতীনসেনের মত নেতাও এখন থাকতে পেরেছেন।"

* * * *

ব্যাপক গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ড—১৯৫০ সন

বরিশালে সংখ্যালঘুদের প্রতি সর্ব্বস্তরের সরকারী কর্ম্মচারীদের অবহেলা, তাচ্ছিল্য এবং অপ্রত্যক্ষ সমর্থনের ফলে যে প্রকারের পরিণতির উদ্ভব হওয়ার আশঙ্কার কথা সতীন্দ্রনাথ মিঃ লিয়াকৎ আলীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন বাস্তবে উহার নিষ্ঠুর পরিণতি দেখা গেল। ১৯৫০ সনের মধ্যভাগে বরিশাল জিলার পল্লী অঞ্চলে সুপরিকল্পিতভাবে এক ব্যাপক লুণ্ঠন, গৃহদাহ নারীহরণ ও হত্যাকাণ্ডের অনুষ্ঠান সুরু হইল! সে বীভৎসতার চিত্র অঙ্কিত না করাই শ্রেয়।

এই বিভীষিকাময় সংবাদ সর্ব্বত্র প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই স্থানীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সতীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিয়া একটী

লিখিত বিবৃতিতে সহি করিতে বলিলেন, যাহাতে উল্লেখ থাকে যে বরিশালের সর্ব্বত্র সাম্প্রদায়িক শান্তি বিরাজ করিতেছে, সুতরাং গুজবে যেন কেহ কর্ণপাত না করেন। এই মিথ্যা, ভ্রান্ত ও দুরভিসন্ধিমূলক বিবৃতি সহি করিতে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ক্রুদ্ধ ম্যাজিষ্ট্রেট বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া তখনই জেলে প্রেরণ করেন।

* * * *

পাকিস্থানে প্রথম কারাবাস

সতীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন পাকিস্থান ব্যবস্থাপক সভ্য। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে উচ্চশ্রেণীর বন্দীর ব্যবস্থা তাহার প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তাঁহাকে রাখা হইল জেলের নিকৃষ্টতম ক্ষুদ্র কুটুরীর মধ্যে—না ছিল আলো-বাতাস বা অন্যবিধ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা। ছিল অখাদ্য আহার, কঠিন শয্যা, দারুণ গ্রীষ্ম ও মশার উৎপাতে নিদ্রাহীন রজনীযাপন। ইহারই মধ্যে তিনি ৮ মাসকাল অতিবাহিত করেন।

এই কারাবাসে রাখিবার জন্য একটী মিথ্যা মামলার আয়োজন করা হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা পরিত্যক্ত হয়।

এই প্রকারের অত্যাচার দ্বারা কি সতীন্দ্রনাথকে দমন করা সম্ভব? বরং কারাগারে থাকিয়াই সতীন্দ্রনাথ সরকারী উচ্চস্তরে দাবী করিলেন যে বরিশালের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে অগৌণে বদলী না করা হইলে বরিশালে সংখ্যালঘুদের বসবাস করা অসম্ভবপর হইয়া উঠিবে। অবশ্য ৮ মাস কারাভ্যন্তরে থাকিবার

পর সতীন্দ্রনাথ মুক্ত হইলেন এবং ইহার পূর্ব্বেই উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটকে অন্যত্র বদলী করা হইয়াছিল।

* * * *

শান্তি-মিশন-১৯৫১

১৯৫০ সনের হাঙ্গামার দরুণ বরিশাল জিলার সর্ব্বত্র হইতে ব্যাপকভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাকিস্থান পরিত্যাগের হুজুগ চলিল। এবারে কৃষিজীবি ও অনুন্নত সম্প্রদায়েয় পল্লীর ভীত্তি টলিয়া গেল—লক্ষ লক্ষ পল্লীবাসী আতঙ্কিত হইয়া চলিল পশ্চিমবঙ্গে।

এই প্রকারের আশঙ্কাজনক পরিস্থিতিতে স্থানীয় শিক্ষিত ও উচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ তরুণ মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে কর্ত্তব্যের আহ্বান আসিল। মুসলমান তরুণ দল এবার জাগ্রত হইলেন। এই ব্যাপক দেশত্যাগ প্রতিরোধ করিবার জন্য তাঁহারা বিশেষভাবে উদ্যোগী হইলেন। তাহাদেরই বিশেষ প্রচেষ্টায় সতীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে একটি শান্তি-মিশন আসিল কলিকাতায়। বিভিন্ন কলোনীতে ভ্রমণ করিয়া দেশে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রত্যেক বাস্তুত্যাগীর নিকট তাঁহারা আন্তরিক আবেদন জানাইলেন।

* * * *

ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তার-১৯৫২ সন

বঙ্গভাষাকে পাকিস্থানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত করিবার দাবীতে পাকিস্থানের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন সুরু হয়।

১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি হইল ২১শে তারিখে ঢাকায় তরুণ ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ। কর্ত্তৃপক্ষ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। সমগ্র দেশব্যাপী ব্যাপক ধর-পাকর সুরু করিলেন। পূর্ব্ববাংলার আদর্শবাদী তরুণ মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে একে একে গ্রেপ্তার করিয়া আবদ্ধ করা হইল।

এই ভাষা আন্দোলনে সতীন্দ্রনাথের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিলনা। কিন্তু উহা না থাকিলে কি হইবে—পাকিস্থানের যে কোন পরিস্থিতিতে ধর-পাকরের আবশ্যকতা হইলে সতীন্দ্র-নাথকে তো আর বাদ দেওয়া চলেনা! পাকিস্থানের অভ্যন্তরে থাকিয়া একটা প্রচণ্ড কর্ম্মপ্রবাহের উৎস থাকিতেন সতীন্দ্রনাথ। সুতরাং যে কোন সুযোগেই হউক উহাকে প্রতিরোধ করিতে হইবে—কর্ত্তৃপক্ষের ইহাই ছিল বাসনা।

গ্রেপ্তারের পর প্রথমে সতীন্দ্রনাথকে রাখা হয় বরিশাল জেলে, পরে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে এবং অবশেষে বগুড়া জেলে। এই কারাবাস ছিল সতীন্দ্রনাথের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। পূর্ব্ববাংলার আদর্শবাদী মুসলমান নেতৃবৃন্দ ও কর্ম্মীদের সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ পরিচয় ও বিশেষ ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। পাকিস্থানে থাকিয়া সতীন্দ্রনাথ যে স্বপ্ন দেখিতেন, সেই স্বপ্নের সার্থকতার আভাস পাইতে থাকেন এই জাগ্রত তরুণদের মধ্যে। নিদ্রিত একটি সম্প্রদায়ের জাগ্রত দীপ্তি দেখিতে পাইলেন এইসব সহকর্ম্মীর অন্তরের মধ্যে। এই সময় হইতেই পূর্ব্ববাংলার অগ্রগামী

নেতৃবৃন্দের মধ্যে মৌলানা ভাসানী, মিঃ আতায়ুর রহমান, মিঃ আবুহোসেন সরকার, সেখ মুজিবর রহমান প্রভৃতির সহিত সতীন্দ্রনাথের সম্ভাব্যপূর্ণ ঘনিষ্ঠতা ও অন্তরঙ্গতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রায় এক বৎসর আটক থাকিবার পর তিনি বগুড়া জেল হইতে মুক্ত হইলেন। মুক্তির পর জেলগেটে স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে মুসলমান সম্প্রদায়ের যে বিপুল সম্বর্দ্ধনা সতীন্দ্রনাথকে দেওয়া হইল—উহা ছিল সতীন্দ্রনাথের একেবারে অভাবনীয়। নূতন উৎসাহে ও উদ্দীপনায় সতীন্দ্রনাথ পুনরায় প্রবেশ করিলেন তাঁহার কর্ম্মযজ্ঞে।

মানুষ সতীন্দ্রনাথ

সমগ্র জীবনের মধ্যে কোন অবস্থায়ও সতীন্দ্রনাথকে মিথ্যা-চারে ব্রতী হইতে দেখা যায় নাই। সত্যপ্রিয়তা ছিল তাঁহার চরিত্রের দৃঢ় ভিত্তি। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয় তখনই, যখন অন্তরকে আচ্ছন্ন করে দুর্ব্বলতা ও ভীরুতা। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের মন ছিল সে সব গ্লানির বহু উর্দ্ধে।

সতীন্দ্রনাথের প্রকৃতির সহজাত তেজ বীর্য্যের সহায়ক ছিল এই সত্যনিষ্ঠা। সুতরাং পরবর্ত্তীকালে পরিণত বয়সে গান্ধীজীর প্রদর্শিত সত্যাগ্রহ ও সর্ব্বোদয়ী আদর্শে অনুপ্রাণিত হইলেও তাঁহার জীবনে সত্যনিষ্ঠার আদর্শ উপ্ত হয় বাল্য ও কৈশোরেই। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ ও স্বামী পূর্ণানন্দ গিরির প্রেরণায় গীতার মাধ্যমে তিনি সেই আদর্শের পথ পাইয়াছিলেন।

প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে গীতা পাঠ ছিল তাঁহার অতি অবশ্য করণীয় কার্য্য। এ বিষয়ে কোন আড়ম্বর বা প্রচারের ভাব ছিলনা। অতি ঘনিষ্ঠ সহচরগণ ব্যতীত অনেকের নিকটই ইহা ছিল অজ্ঞাত। এতদ্ব্যতীত এই গীতা পাঠেও একটু বৈশিষ্ট্য ছিল। একান্তে বসিয়া পাঠ না করিয়া, কণ্ঠস্থ শ্লোক সমূহ পাদচারণা করিতে করিতে উচ্চস্বরে আবৃত্তি করিতেন।

তাঁহার দেহমনের পূর্ণ সুতীব্র বেগ প্রকাশ তখন মূর্ত্ত হইয়া উঠিত।

আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতা সতীন্দ্রনাথ সহ্য করিতেন না। যখন যে কার্য্যে ব্রতী হইতেন উহা পূরণার্থে সর্ব্বপ্রকারের নৈতিক পন্থা গ্রহণে দ্বিধা করিতেন না। শারীরিক শ্রম বা ক্লান্তিকে উপেক্ষা করিয়া প্রয়োজন বোধে বিনিদ্র রজনী পদব্রজে ভ্রমণ করিতেও কোন প্রকার আলস্য তাঁহার ছিল না। এই ভাবই ছিল জীবনের শেষ পর্য্যন্ত।

জীবনব্যাপী মান-সম্ভ্রম বিষয়ে সতীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারেই উদাসীন। কর্ম্মের প্রয়োজনে যে কোন গৃহে যখন তখন গমন করিতে কোন সঙ্কোচ ছিলনা। প্রতিষ্ঠা-বিহীন ব্যক্তির গৃহে অযাচিতভাবে গমন করিলে সম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে পারে—এইরূপ চিন্তার অবসরই তাঁহার ছিল না।

সেই কারণেই দীর্ঘ বৎসর যাবৎ কর্ম্মোপলক্ষে বরিশাল সহরে থাকাকালীন স্বেচ্ছায় তিনি বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহে আহার গ্রহণ করিতেন বিনা সঙ্কোচে। স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে কখনও স্বস্থানে বা স্বপাকে আহার্য্য প্রস্তুত করা হইলেও জীবনের বহু বৎসরই আহারের ব্যবস্থা ছিল বিভিন্ন গৃহে। তাঁহার সহকর্ম্মী ৺তারাপদ ঘোষ, শ্রীসুশীল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপ্রাণকুমার সেন প্রভৃতির গৃহ ব্যতীত ৺শরৎচন্দ্র গুহ, শ্রীবিজয়ভূষণ দাশগুপ্ত [illegible]অমিয়কুমার রায় চৌধুরী, শ্রীনগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য, শ্রীঅবনী কুমার ঘোষ, শ্রীমতী শান্তিসুধা ঘোষ প্রভৃতি হিতৈষীদের গৃহে

বিভিন্ন সময়ে একাদিক্রমে আহারের ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত হইত। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন স্থায়ী গৃহ ছিল না—বরিশালের অশ্বিনীকুমার টাউনহলের একটী কোঠাই ছিল তাঁহার থাকিবার আবাস এবং কর্ম্মের কেন্দ্রস্থল।

লোক-ব্যবহারে সতীন্দ্রনাথ বাহ্যতঃ দৃঢ়চেতা ও কঠোর প্রকৃতির ছিলেন। অকপট, স্পষ্টবাদী এবং আন্তরিকভাবে অতীব দরদী ছিলেন। মন রক্ষা করিয়া কথা বলিবার তাঁহার অভ্যাসই ছিল না। সমগ্র জীবনে নিজস্ব বস্তু বা দ্রব্য বলিয়া সতীন্দ্র-নাথের কিছুই ছিলনা,—পরিধেয় দুইখানা বস্ত্র এবং ছিল ন্যূনতম শয্যা। নিজস্ব বাক্স-পেটরা প্রভৃতির বাহুল্য তাঁহার ছিল না কোনদিন। যাবতীয় অর্থাদি, এমন কি ব্যবস্থাপক সভার সভ্য থাকাকালীন প্রাপ্য ভাতার অর্থ প্রভৃতিও সহকর্ম্মীগণই গ্রহণ করিতেন—নিজের নিকট কিছুই রাখিতেন না। সমগ্র জীবনটাই ছিল উন্মুক্ত—সকলের দৃষ্টির সম্মুখে।

স্বভাবতই সতীন্দ্রনাথ ছিলেন গুরুগম্ভীর ও বিশেষ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। তাঁহার উপস্থিতিতে চপলতার প্রকাশ আদৌ ছিল না, তবে সহকর্ম্মীদের পরিবেশে নির্দ্দোষ রসিকতাও যেমন উপভোগ করিতেন তেমনি শিশুর সান্নিধ্য বা নির্দ্দিষ্ট সুশ্রাব্য সঙ্গীত তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। সমগ্র জীবনের মধ্যে সিনেমা বা থিয়েটার দেখিবার সুযোগ বা ইচ্ছা তাঁহার হয় নাই।

দীর্ঘ দিবসের কংগ্রেস কার্য্যোপলক্ষে আবশ্যকীয় অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল তাঁহার বিশেষ স্বতন্ত্র ধরণের। অর্থ দিতে

সক্ষম ব্যক্তি বিশেষের নিকট অনুনয় বিনয় সহযোগে অর্থের আবেদন তিনি করিতে জানিতেন না!—সরল-স্পষ্ট ভাষায় দাবী করিতেন প্রয়োজনীয় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিবার জন্য। দাবী গৃহীত হয় তো ভাল—না হইলে ক্ষোভ নাই—এই প্রকারের ছিল মনের ভাব। আবশ্যকীয় অর্থ দাবী করিবার অধিকার কর্ম্মীর রহিয়াছে—কৃপা প্রার্থনার কোন অবসর সেখানে নাই—এই ভাবেই ইতিকর্ত্তব্যটিকে তিনি বুঝিতেন।

এই প্রকারের মনোভাব প্রকাশ পাইয়াছিল শ্রীঘনশ্যাম দাস বিড়লার সান্নিধ্যে আসিয়া। পটুয়াখালির সত্যাগ্রহ উপলক্ষে পূর্ব্ব ব্যবস্থামত বেলা ১০ ঘটিকার সময় সতীন্দ্রনাথ আসেন মিঃ বিড়লার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহার হিন্দুস্থান পার্ক ভবনে। সেই সময়ে তিনি থাকিতেন নগ্নপদে ও গাত্রাবরণে থাকিত ফতুয়া ও চাদর। দ্বিতলস্থ প্রশস্ত গদি-বিছান বিশ্রাম গৃহে মিঃ বিড়লা বিশেষ যত্নের সহিত সতীন্দ্রনাথকে আহ্বান করিলেন। দুগ্ধফেন-নিভ সেই ফরাসের উপর মলিন পদদ্বয়ের চিহ্ন অঙ্কিত করিতে করিতে সতীন্দ্রনাথ অগ্রসর হইয়া গেলেন অম্লান বদনে।

পরবর্ত্তীকালে মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একবার সতীন্দ্রনাথ সহ আসেন মিঃ বিড়লার গৃহে। সতীন্দ্রনাথের সহিত পরিচয় করাইবার সময় প্রকাশ পাইল যে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা রহিয়াছে দীর্ঘ দিবসের। কিন্তু এই ঘনিষ্ঠতার সুযোগে সতীন্দ্রনাথ আপন হীনতা বা দীনতা কখনও প্রকাশ করেন নাই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সহিত

সতীন্দ্রনাথের দীর্ঘ বৎসরের সম্পর্ক ছিল অতীব প্রীতির ও শ্রদ্ধার। ডাঃ রায়ের নিকট হইতে সতীন্দ্রনাথ নিয়মিতভাবে অকুণ্ঠচিত্তে আর্থিক ও অন্যবিধ সহায়তা পাইতেন। ব্যক্তিগত কারণে দলাদলির ঊর্দ্ধে থাকিবার প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও উদারতা উভয়ের মধ্যে সমভাবে প্রকাশ পাইত। এই নৈকট্য ও আন্তরিক সৌখ্যের দাবীতে সমবেদনশীল ডাঃ রায় সতীন্দ্র-নাথের ন্যায় দৃঢ়চেতা স্বাধীনতাপ্রয়াসী কর্ম্মীর পাকিস্থানে অবস্থান হেতু লাঞ্ছনার আশঙ্কায় তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গে আসিবার জন্য বার বার ব্যর্থ অনুরোধ করিয়াছিলেন।

সতীন্দ্রনাথের বৈপ্লবিক জীবনের পথপ্রদর্শক 'যুগান্তর' সংস্থার প্রবীণ নেতৃবৃন্দের সহিত আজীবন সম্পর্ক ছিল আন্ত-রিকতাপূর্ণ। বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি কনিষ্ঠের যে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা থাকে তাহারই প্রকাশ ছিল তাঁহার সর্ব্ব ব্যবহারে। এই কারণেই শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ৺বিপিনচন্দ্র গাঙ্গুলী, ৺কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরিকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ চৌধুরী প্রভৃতি সকলের সহিত ছিল আজীবন হৃদ্যতা।

'যুগান্তর' দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীযুত সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও ৺পূর্ণচন্দ্র দাসের সহিত সতীন্দ্রনাথের ছিল বিশেষ অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠতা। সুভাষচন্দ্রের সমর্থকরূপে প্রাদেশিক কংগ্রেস রাজ-নৈতিক নীতি পরিচালনা বিষয়ে উভয়ের পরামর্শ তিনি সর্ব্বাধিক মূল্যবান মনে করিতেন।

বরিশালের অন্যতম বৈপ্লবিক সংস্থা 'অনুশীলন' দলের স্থানীয়

পরিচালক শ্রীযুত যতীন রায়, শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীদেবেন ঘোষ প্রভৃতির সহিত সতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক মত-বিরোধ থাকিলেও জাতীয় সমস্যামূলক বিভিন্ন পরিণতির উদ্ভবে সকলেই সমবেতভাবে কর্ম্মে অগ্রণী হইতেন এবং অবস্থা বিশেষে সতীন্দ্র-নাথের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতেন।

যুগান্তর দলের নেতা শ্রীযুত মনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ ছিলেন বরিশাল জিলার স্বনামধন্য বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্ম্মী। স্থানীয় রাজনীতি ক্ষেত্রে তাহাদের পৃথক সত্তা থাকিলেও সতীন্দ্রনাথের সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্যমূলক ঐক্য ছিল। কতকটা উভয়ের পরিপূরকরূপেই কর্ম্ম চলিত এবং তাহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রাদেশিক রাজনীতিতে ব্যাপৃত থাকিবার দরুণ উক্ত নেতৃদ্বয়ের বা তাহাদের অনুগামীদের সহিত সতীন্দ্রনাথের বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য বিরোধ উদ্ভব হইত না।

সতীন্দ্রনাথের প্রতি সহকর্ম্মীদের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল অতীব গভীর। তাঁহার নির্দ্দেশে যখন তখন বিপদসঙ্কুল পথে ঝাঁপাইয়া পড়া, এমন কি জীবন বিসর্জ্জন করাও বিশেষ অসম্ভব ব্যাপার ছিল না! তরঙ্গায়িত প্রবাহের ন্যায় অগণিত কর্ম্মীর দল কর্ম্মের আহ্বানে যেমন অগ্রসর হইয়া আসিত, কর্ম্ম অবসানে আবার তেমনই চলিয়া যাইত। জীবনব্যাপী স্থায়ীভাবে সতীন্দ্রনাথের সহিত কর্ম্মে যুক্ত থাকা ছিল অতীব কঠিন ব্যাপার! বিরামবিহীনভাবে প্রতি মুহূর্ত্তে কর্ম্মচাঞ্চল্য ছিল তাঁহার অব্যাহত। তাঁহার উদ্যম ও তীব্র কর্ম্মধারার সহিত তাল

রক্ষা করা অনেকের পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু এজন্য কর্ম্মীর অভাববোধ তিনি কখনও করেন নাই—নূতন কর্ম্মীর দল সৃষ্ট হইত তাঁহার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের প্রেরণায়। যেখানে কর্ম্ম থাকিবে, কর্ম্মী আপনা হইতেই আসিবে—এই বিশ্বাস ছিল সতীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী। সুতরাং বরিশাল জিলার প্রগতিশীল মুসলমান তরুণ যে সব কর্ম্মীর সান্নিধ্য পাইয়া সতীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হইয়াছেন উহাদের মধ্যে মিঃ বি, ডি, হবিবুল্লা, মিঃ লকিতুল্লা, মিঃ এমদাদআলী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

* * * *

সতীন্দ্রনাথের পরিবার

জীবনে সতীন্দ্রনাথ আপন নীড় বাঁধিবার অবসর পান নাই —তিনি ছিলেন চিরকুমার। বহু আশা ও ভরষার উপর যে পৈত্রিক পারিবারিক বন্ধন রচিত হইয়াছিল, উহা সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হইয়া গেল তখন রীপণ কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্ররূপে যখন তিনি বৈপ্লবিক কার্য্যে প্রবেশ করেন।

পিতা ৺ নবীনচন্দ্র সেন দেহরক্ষা করেন ১৯২২ সনে যখন সতীন্দ্রনাথ ছিলেন কারাভ্যন্তরালে। পিতার মৃত্যুর পর তাঁহাদের যৌথ পরিবারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ শৈলেন্দ্রবিহারী সেনগুপ্ত।

শৈলেন্দ্রবিহারী ছিলেন পটুয়াখালী সহরের সর্ব্বজনমান্য ও সর্ব্বধন্য পুরুষ। উদার, মহৎ, ধার্ম্মিক, পরোপকারী ও দানশীলরূপে সমগ্র জীবনে যেরূপ সর্ব্বশ্রেণীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি

পাইয়াছেন উহা বর্ত্তমানকালে বিশেষ দুর্লভ। জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আপন পরিবারেব স্বাচ্ছন্দ্যের বিনিময়ে কত যে গোপন দান করিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই।

শৈলেন্দ্রবিহারী ও তাঁহার অনুজ নগেন্দ্রবিহারী তাঁহাদের সমুদয় সামর্থ্য এবং স্নেহ ও প্রীতি দ্বারা সতীন্দ্রনাথকে তাঁহার রাজনৈতিক কর্ম্মের অকুণ্ঠ সহায়তা করিয়া গিয়াছেন। এই পরিবার হইতে সতীন্দ্রনাথ সর্ব্ব সুযোগ পাইয়া থাকিলেও, উহার প্রতিদানে পারিবারিক নিয়মানুসারে যাহা করণীয় বলিয়া বিবেচিত হয় তাহাও সতীন্দ্রনাথ করেন নাই। সতীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা বা প্রভাব দ্বারা পারিবারিক কোন সুযোগ-সন্ধান আসে নাই।

সতীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠতাত পুত্র শ্রীহেমচন্দ্র সেন বি, এ, কিছুদিন রাজনৈতিক কারণে কারাবাস করিলেও সুদীর্ঘ দিন পটুয়াখালী এবং পরে ভোলা সহরে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকরূপে কার্য্য করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে শ্রীমহেন্দ্রনাথ সেন শারীরিক অসুস্থতা না হওয়া পর্য্যন্ত চিরকুমার থাকিয়া সতীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত পটুয়াখালীর 'ছাত্র-পাঠাগার' পরিচালনা করিয়াছেন, অপর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন এম, এ, বি, এল, অসহযোগ আন্দোলনে সতীন্দ্রনাথের সহকর্ম্মীরূপে কর্ম্ম করিয়া, তৎপর দীর্ঘ বৎসর পাটনায় ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'সদাগত-আশ্রমের' অধ্যাপকরূপে কার্য্য করিয়াছেন।

সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেন্দ্রবিহারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শিশিরকুমার সেনকে ছাত্রাবস্থায় সতীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক আরব্ধ আন্দোলনের কোন এক প্রতিক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি হত্যা-মামলায় জড়িত হইয়া বহুদিন বিচারসাপেক্ষে হাজতে অনিশ্চিত জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে যাঁহারা রাজনৈতিক কারণে লাঞ্ছনা বরণ করেন তাঁহাদের মধ্যে ডাঃ শান্তি সেনগুপ্ত প্রেসিডেন্সী কলেজে পিকেটিং করিতে অগ্রসর হইয়া পুলিস সার্জ্জেণ্ট কর্ত্তৃক এত তীব্রভাবে প্রহৃত হইয়াছিলেন যে মৃতকল্প মনে করিয়া তাঁহাকে পুলিস ভ্যান হইতে পথপ্রান্তে অচৈতন্য অবস্থায় নিক্ষেপ করা হইয়াছিল।

সতীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের বিবিধ আন্দোলনেও তাঁহার বৈমাত্রেয় ভগ্নীগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ অবিবাহিত অবস্থায় থাকাকালীন সক্রিয়ভাবে উহাতে যোগদান করিতেন। পাকিস্থান সৃষ্টির পর তাঁহার কতিপয় শিক্ষিতা ভ্রাতুষ্পুত্রী অবিবাহিত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন দ্বারা পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহারই অবসরে সতীন্দ্রনাথের কলিকাতা বাস-কালীন তাঁহার সেবা-যত্নের ভার সানন্দে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জ্যেঠাইমাকেই সতীন্দ্রনাথ আপন মা বলিয়া জানিতেন ও ভাবিতেন। জ্যেঠাইমাও তেমনি আপন গর্ভজাত পুত্রের অধিক মাতৃস্নেহে তাঁহার 'ফক্কা'কে আপন বক্ষে টানিয়া লইতেন। (ছোট বেলার ডাক নাম ছিল ফক্কা)।

সতীন্দ্রনাথের 'বড় বৌদিদি' অর্থাৎ শৈলেন্দ্রবিহারীর সাধ্বী

স্ত্রীর মধ্যে যেন প্রকাশমান ছিল তাহাদের সমগ্র পরিবারের মর্ম্মবাণী। সতীন্দ্রনাথের যাবতীয় দাবী-দাওয়া ছিল তাঁহার বৌদির নিকট। অদ্ভুত চরিত্র মাতৃরূপিনী এই 'বৌদির'। বৃহৎ পরিবারের সর্ব্বজনের জন্য নিরবচ্ছিন্ন সেবার মধ্যে কি প্রকারে যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিলাইয়া দিতে হয়—তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এই 'বৌদি'। নির্ব্বিরোধী, নিরহংকারী, সেবাব্রতী, স্নেহ-শীলা এই দেবীর পার্শ্বে ছায়ার মত আর একজন যে মমতাময়ী সতত বিচরণ করিতেন, তিনি হইলেন সতীন্দ্রনাথের ছোট বৌদি নগেন্দ্রবিহারীর স্ত্রী। এই সব চরিত্র যেন বাংলাদেশে এখন লুপ্তপ্রায়।

দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর্ম্মে যে পরিবারের দীর্ঘ বৎসর-ব্যাপী অকুণ্ঠ ও নিরবচ্ছিন্ন দান রহিয়াছে—ঐতিহাসিক পট-পরিবর্ত্তনের আবর্ত্তে ছিন্নমূল হইয়া উহার বংশধরগণকে আজ পশ্চিমবাংলায় অসহায় সঙ্গতিহীন, সামর্থ্যহীন ও অনিশ্চিত জীবন যাপন করিতে হইতেছে!

শেষ কারাবাস

১৯৫৪ সনের মে মাসে পূর্ব্বপাকিস্থানের রাজনীতি এক বৈপ্লবিক পরিস্থিতির মধ্যে অতিক্রম করিল। নাটকীয়ভাবে মেজর জেনারেল ইস্‌কান্দার মির্জ্জার গভর্ণররূপে শপথ গ্রহণ, ৯২এ ধারা প্রবর্ত্তন, মিঃ ফজলুল হকের যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা বাতিল, মিঃ হকের স্বগৃহে আটক, দেশব্যাপী ব্যাপক ধরপাকড় প্রভৃতি ঘটনাবলীর ক্ষিপ্রগতি জনসাধারণকে কতকটা কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় করিল। বরিশালেও দ্রুতগতিতে যুক্তফ্রণ্টের সমর্থক প্রগতিশীল ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করা হইল। এই গ্রেপ্তারের হিড়িকে ১লা জুন তারিখে সতীন্দ্রনাথকেও তাঁহার পটুয়াখালীস্থ স্বগৃহ হইতে গ্রেপ্তার করা হইল।

৬০ বৎসর বয়সে যখন সাধারণত লোকে শারীরিক বিশ্রাম কামনা করেন, তখন সেই দেহে কারাগারের কঠোরতা গ্রহণে মন স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়। কিন্তু সতীন্দ্রনাথের মন বা প্রকৃতি ছিল অদ্ভুত ধাতুতে গঠিত। ক্ষণিকের তরেও এই ক্লেশ-জনক জীবন যাপন করিবার দরুণ তাঁহার কোন বিরক্তি বা ক্ষোভ প্রকাশ পাইল না। বরং কারাগারে প্রগতিশীল মুসলমান কর্ম্মীদের মধ্যে নিজকেও দেখিয়া তাঁহার মন বেশ উৎফুল্ল হইয়া

উঠিল। আদর্শবাদী জীবনের দৃষ্টিতে তিনি তাঁহার এই নূতন কারাবাসকে সানন্দে বরণ করিলেন। কেননা তাঁহার নিজের ভাষায় "প্রধান কর্ম্মীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশ্রিত হইবার সুযোগ হইল। ইহার ফল কর্ম্মক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। Suffering এর পথে এদের দীক্ষা হইল মাত্র সুরু।" কারাগারের ক্লেশের মধ্যে রহিয়াও বাঙ্গালী তরুণ মুসলমান যুবকগণ দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের প্রয়াসে দুঃখ কষ্ট বরণ করিবার জন্য যে প্রস্তুত হইতেছে—ইহাই তাঁহার জীবনের রূপায়িত আদর্শ।

গ্রেপ্তার করিবার সংবাদ শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গেই পটুয়াখালীর মুসলমান সম্প্রদায়ের ছাত্র ও স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে শত-সহস্র জনতা যে ভাবে তাঁহাকে অভিনন্দন করিল তাহা সতীন্দ্রনাথের জীবনে অভূতপূর্ব্ব! তিনি হিন্দু না মুসলমান এ প্রশ্ন তাহাদের ছিলনা—তিনি তাহাদের একান্ত আপনার জন—জনতার এই অভিব্যক্তিই তাহাকে মুগ্ধ করিল, অভিভূত করিল। পটুয়াখালী জেল হইতে ৭ই জুন যখন তাঁহাকে বরিশাল জেলে পাঠান হইল তখন পথে, ষ্টেশনে, ষ্টীমারে কাতারে কাতারে জনতার আবেগপূর্ণ ব্যবহারের মধ্যে জাগ্রত নবশক্তির এক দুর্লভ ইঙ্গিত তাঁহার দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইল।

দেহের বার্দ্ধক্যকে উপেক্ষা করিয়া মনের তারুণ্যের সহিত তিনি কারাজীবন সুরু করিলেন। প্রত্যহ ভোর ৪ ঘটিকায় শয্যাত্যাগ করিবার তাঁহার বরাবরের অভ্যাস ছিল। প্রাতঃকৃত্যাদির পর গীতা ও বিভিন্ন পুস্তকাদি পাঠ, তৎপর ঠিক একঘণ্ট চরকায়

সুতা কাটা, পরে জেল প্রাঙ্গণে ভ্রমণ ছিল তাঁহার নিত্য কার্য্য। সমস্ত নিরাপত্তা বন্দীদের কাহার কি অসুবিধা আছে অনুসন্ধান করিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা উহা দূরীভূত করিবার চেষ্টা করিতেন।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে একজন বন্দী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'মুসলমানদের দেশে Civil Liberty সম্ভব নয়, Democracy অসম্ভব, democratically minded লোক টিঁকিতে পারে না।'

কিন্তু এই প্রকারের অন্ধ কারণ দর্শাইয়া দেশ পরিত্যাগ করিবার মানসিক অবসাদ বা আত্মবিশ্বাসের অভাব সতীন্দ্রনাথের কোন দিনও ছিল না। কাজেই এই সম্পর্কে তাঁহার মনোভাব তিনি ব্যক্ত করিলেন মিঃ টমাস পেইনের সেই বিখ্যাত উক্তির দ্বারা—'My home is there, where Liberty is not.'

এই বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল এবারকার বন্দীজীবনে—এই সব নূতন সহযোগিদের সম্পর্কে আসিয়া। তিনি দেখিলেন—'কি Fine কতগুলি feature এই সব মুসলমানদের ভিতর—শিক্ষিত, অশিক্ষিত, ধনী, নির্ধন, ছোট, বড়, সবার ভিতর। Disinterested, Selfless, Courageous leadership হইলে brilliant কার্য্য হইত। material খুব fine'।

* * * *

রংপুর জেল

প্রায় দেড় মাস বরিশাল জেলে আটক থাকিবার পর তাঁহাকে রংপুর জেলে বদলী করা হইল। ২১শে জুলাই রংপুর জেলে পৌঁছিলেন। প্রথমে উঠিলেন ৩নং ওয়ার্ডে। সেখানে

অন্যান্য নিরাপত্তা বন্দীদের মধ্যে দুইজন ছিলেন এম্, এল, এ—মিঃ আজিজ মিঞা ও মিঃ এম, মণ্ডল। এখানে উঠিবার কিছু পরেই সংবাদ আসিল যে আই, জির নির্দ্দেশমত তাঁহাকে পৃথক থাকিতে হইবে। সুতরাং হাসপাতালের একতলার একটী কামরায় তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল।

চিরাচরিত অভ্যাস বশে এখানেও তিনি সকল নিরাপত্তা-বন্দীদের অভাব-অভিযোগের সন্ধান লইতেন এবং আবশ্যকীয় সহায়তা করিতেন। এই সময় প্রবল বর্ষা চলিতেছিল কাজেই তিনি তাঁহার waterproof খানা ৩নং ওয়ার্ডের ব্যবহারের জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তৎসহ কতিপয় নিজস্ব পাঠ্য পুস্তকও পাঠাইলেন। অযাচিত এই ব্যবহারে সবাই মুগ্ধ হইলেন।

জেল-হাসপাতালের নীচতলার যে কামরায় তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল তাহারই ঠিক উপরের তলায় ছিল জেলের টি, বি, ওয়ার্ড এবং তখন যক্ষ্মা রোগীগণ সেখানে থাকিত। উক্ত টি, বি, ওয়ার্ড এর মেঝের বিভিন্ন ভগ্নস্থান হইতে প্রত্যহ তাঁহার কামারার মধ্যে জল পড়িতে তিনি লক্ষ্য করিলেন। ২৪শে জুলাই দিন রাত্রে বেশ পরিমাণে জল পড়িল। এই গুরুতর ছোঁয়াচে রোগের সংস্পর্শে থাকিবার বিপদের কথা উল্লেখ করিয়া পরদিনই তিনি জেল কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন তাঁহাকে অন্যত্র থাকিবার ব্যবস্থার জন্য। পরেও বহুবার মৌখিকভাবে এবং পত্রযোগে এই কথা তিনি কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন কিন্তু তাঁহার স্থান পরিবর্ত্তনের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কার্য্যত কোনই প্রতিকারই হইল না।

একটি কয়েদীর সন্দেহজনক মৃত্যু

৮ই অক্টোবর তিনি সংবাদ পাইলেন যে জেলের Cell এ একটী কয়েদী মারা গিয়াছে। এই কয়েদীকেই পূর্ব্ব দিন বেলা ১১।১২টার সময় বড় জমাদার, জমাদার, সিপাহী ও কতিপয় কয়েদী দ্বারা জোর জুলুমসহ উক্ত Cell এর দিকে লইয়া যাইতে তিনি দেখিতে পান। উক্ত কয়েদী Cell এ না ঢুকিবার জন্য দরজা ধরিয়া বাধা দিতেছিল। অবশেষে প্রবল শক্তির নিকট পরাভূত হয়। মৃত্যুর দিন সকালে দেখা গেল যে সে অচেতন অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

এই মৃত্যুর ঘটনা সতীন্দ্রনাথের অন্তরে এক তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করিল। সহায় সম্বলহীন, দরিদ্র এবং আবদ্ধ একটী নিরস্ত্র লোককে এমন নিষ্ঠুরভাবেই পুনঃ পুনঃ প্রহার করা হইল—যাহার পরিণতিতে হইল তাহার মৃত্যু, অথচ এজন্য দেখা দিলনা কোন আলোড়ন, কোন প্রতিকার ব্যবস্থা। রাষ্ট্রের শাসন-যন্ত্রের একটী প্রধানতম কেন্দ্রে যদি সংঘটিত হইতে পারে এমনসব ঘটনা, তবে সে রাষ্ট্রের বা সে দেশের ভবিষ্যৎ কোথায়!

এই কয়েদীর মৃত্যু এবং সতীন্দ্রনাথের মৃত্যু—এই দুইটির মধ্যেই যেন রহিয়াছে এক মহা-রহস্য। সে রহস্যজনক মৃত্যুর কাহিনী রহিয়াছে উভয় মৃত্যুর অন্তর্বর্ত্তী দীর্ঘ অবসরের মধ্যে উদ্ঘাটনের প্রতীক্ষায়—ভাবিকালের অন্তরালে।

সংবাদ পত্রের বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হইতে পারে এমন সব দুঃসাহসিকতাপূর্ণ কার্য্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া হয়তো

অনেকের পক্ষেই বিচিত্র নহে, কিন্তু অজ্ঞাত, অখ্যাতভাবে সকলের অলক্ষ্যে—বিপদকে উপেক্ষা করিয়া নিজেকে লিপ্ত করিবার মধ্যে যে মানসিক বীরত্বের প্রয়োজন হয় সতীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল তাহা পূর্ণ মাত্রায়। এই কয়েদীর মৃত্যু ব্যাপার লইয়া এত ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া আর দশজনের ন্যায় তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানাইয়া শান্ত থাকাই তো বিশেষ বুদ্ধিমানের কার্য্য হইত! কিন্তু তাহা না করিয়া তাঁহার এই ৬০ বৎসর বয়সের কারাভ্যন্তরের মধ্যে সত্যের প্রতিষ্ঠার মানসে তিনি দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। সতীন্দ্রনাথ দাবী করিলেন—মৃতের শবব্যবচ্ছেদ সহ পুলিস-কর্ত্তৃক মৃত্যু রহস্য উদ্‌ঘাটন করা হউক।

ইহারই স্বাভাবিক পরিণতি ছিল জেলারের সহিত সতীন্দ্রনাথের তিক্ততা বৃদ্ধি। উক্ত মৃত্যু ব্যাপারের উপরে যবনিকা টানিবার মানসে জেল কর্ত্তৃপক্ষ জানাইলেন যে তাহাদের নিজস্ব অনুসন্ধানে তাহারা সন্তুষ্ট—তদরিক্ত কিছু করিবার নাই। উত্তরে সতীন্দ্রনাথ আবেদন করিয়া বলিলেন—"Justice not only to be done but all must feel that Justice has been done."—কিন্তু বিশেষ কিছুই হইল না।

সতীন্দ্রনাথ নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। যত প্রকার আইনসঙ্গত উপায়ে সম্ভব, এই নিষ্ঠুর ও বেদনাদায়ক মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য ক্রমাগত দাবী উত্থাপন করিতে থাকেন। শুধু ইহাই নহে, জেলের অভ্যন্তরস্থ অসহায় কয়েদীদের প্রতি নানা প্রকার জুলুম-অত্যাচারের প্রতিবাদও সতীন্দ্রনাথ করিতেন। জেলারকে

তিনি জানাইলেন সর্ব্ববিধ আইনসম্মত উপায় অবলম্বনের দ্বারাও যদি ইহার প্রতিকার না হয় তবে নিজে লাঞ্ছনা (suffering) গ্রহণের ব্রতদ্বারাও তিনি ইহার প্রতিবিধান করিবেন।

ইহারই ফলে সুরু হইল সতীন্দ্রনাথের কারাজীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিবার নানা আয়োজন।

তাঁহার রান্নার ব্যবস্থা পৃথক হইল। দৈনিক বরাদ্দের অপ্রচুরতার দরুণ অন্য জিনিষের মূল্যের পরিবর্ত্তে সিদ্ধ ও ভাত খাইবার মতন ঘৃত দিবার জন্য জানান হইল। কিন্তু উহাও যখন দেওয়া হইল না তখন তাঁহার নিজ ব্যক্তিগত জমা অর্থ হইতে উহা ক্রয় করিবার জন্যও অনুরোধ করা হইল। কিন্তু তাহাও নিষ্ফল হইল। শারীরিক প্রয়োজনে স্নানের যে উষ্ণ জল পূর্ব্বে দেওয়া হইত উহা বন্ধ হইয়া গেল—দৈনিক বরাদ্দ মত প্রাপ্ত অপ্রচুর কয়লা দ্বারা আবশ্যকীয় রন্ধন কার্য্য হওয়া যখন দুষ্কর তখন তদরিক্ত কার্য্য করা সম্ভব ছিল না। সতীন্দ্রনাথের সহিত কোন কয়েদী বা পাহারায় রত সিপাহীর কথা বলা নিষিদ্ধ হইল। প্রত্যহ ভোরে এবং বৈকালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং নির্দ্ধারিত সময়ে যে ভ্রমণের ব্যবস্থা ছিল উহা সঙ্কুচিত হইল এবং অধিকন্তু সতীন্দ্রনাথের পাহারার জন্য সিপাহী নিযুক্ত করা হইল। অবশ্য এই অপমানজনক ব্যবহারের প্রতিবাদে সতীন্দ্রনাথ ভ্রমণ বন্ধ রাখিয়া গৃহের মধ্যেই সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন। ইহার উপর নূতন করিয়া অসহনীয় উৎপাত সৃষ্টি করা হইল। রাত্রের তালা-বন্ধের পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত সময় আগাইয়া আনিয়া সাধারণ [illegible]

গৃহবন্ধের সময়ের সহিত সতীন্দ্রনাথকেও গৃহে আবদ্ধ করা হইত। রাত্রে আবদ্ধ গৃহে তাঁহাকে পাহারা দিবার জন্য অতিরিক্ত ৫জন কয়েদীকে একই গৃহে আবদ্ধ রাখিবার ব্যবস্থা হইল। শুধু তাহাই নয় জেল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ নির্দ্দেশমত উক্ত কয়েদীর দল বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত সিপাহীদের উদ্দেশ্যে উচ্চস্বরে চীৎকার করিয়া গণনার অভিনয় করিত—যাহাতে সতীন্দ্রনাথের নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটে। উক্ত গৃহের জানালা দরজা তালা প্রভৃতি পরীক্ষার বাহানায় বাহিরের সিপাহীগণ মুহূর্মুহু উচ্চ শব্দাদি করিতে থাকে। সুতরাং এই সব কার্য্যাদির ফলে সতীন্দ্রনাথকে প্রায়ই বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইয়াছিল।

* * * *

ঢাকা সরকারী দপ্তরে পত্র

রংপুর জেলের বিবিধ অনাচার বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সতীন্দ্রনাথ ঢাকায় স্বরাষ্ট্র বিভাগে পর পর কয়েকখানি পত্র প্রেরণ করেন। ২২শে নবেম্বর, ১৯৫৪, তারিখের পত্রে বিশেষভাবে তাঁহার বাসস্থানের উপরিতলাস্থ যক্ষ্মা রোগীর গৃহের ভগ্ন মেঝে হইতে যে ক্রমাগত নোংড়া জল বিভিন্ন স্থানে পতিত হইত এ বিষয়ে উল্লেখ করা হয়। জানান হয়—
"(1) Continued accomodation in Hospital bellow T. B ward, (2) Latrine of T. B. ward leaking for a month in 4/5 places, (3) Kitchen near T. B ward, and two latrines full of flies—no effective

flyproof, cats carrying infections, (4) no segregation of T. B patients—free mixing on veranda—T. B patients spitting wreeklessly—the present arrangements are dangerous for me and others."

কিন্তু উক্ত সব পত্রের কোন উত্তর দেওয়া বা উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইল না! সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইল।

* * * *

রোগের পূর্ব্বাভাষ

তারপর ফলিল অবশ্যম্ভাবী ফল। ১৯৫৪ সনের নবেম্বরের শেষের দিক হইতেই সতীন্দ্রনাথের শরীর বিশেষ ভাবে খারাপ হইয়া পড়িল। তাহার উপর চলিত নানাপ্রকার হট্টগোল-চীৎকার। ঐ সব কারণে বহু বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইল।

নভেম্বর ও ডিসেম্বরের অর্দ্ধমাস অতিবাহিত হইল—পুষ্টিকর আহারের অভাব, নিদ্রাহীন রজনী যাপন, বহির্ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা, কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলা, অনাদর, তাহাদের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্টাচরণের প্রচেষ্টা এবং সর্ব্বোপরি টি, বি, রোগের বিভীষিকাময় বিস্তৃতির আশঙ্কা—ইহারই পরিণতিতে সতীন্দ্রনাথের শরীর ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া পড়িল। স্থানীয় জেলের বিশৃঙ্খলা এবং তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা উল্লেখ করিয়া ন্যূনকল্পে ৬।৭ খানা পত্র তিনি ঢাকার স্বরাষ্ট্র দপ্তরেও পাঠাইয়াছেন, কিন্তু কোন উত্তর তিনি পান নাই। তন্মধ্যে শেষ পত্র তিনি পাঠাইয়াছিলেন রংপুর জেল হইতে ১৯৫৪ সনের ১০ই ডিসেম্বর। ইহা ব্যতীত

জেলের সুপারকেও অসংখ্যবার মৌখিক ও পত্রযোগে তিনি সে কথা জানাইয়াছেন কিন্তু সবই নিষ্ফল !

* * * *

পাবনা জেল

অনেক লেখালেখি, অনেক হাঙ্গামার পর অবশেষে সতীন্দ্রনাথকে রংপুর জেল হইতে পাবনা জেলে বদলীর হুকুম আসে। যে সমস্ত নিরাপত্তা বন্দী ছিলেন তাহাদেরও অন্যত্র বদলী করা হইল। ২১শে ডিসেম্বর রংপুর ত্যাগ করিয়া ২৩শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায় তিনি পাবনা জেলে পৌঁছিলেন।

এর পরই আসিল সতীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ-অধ্যায়। সে অধ্যায় নিরন্তর প্রতি দেশবাসীর মনে এই প্রশ্নই জাগাইয়া তুলিবে—কি হইল এত বড় এক মহান আদর্শবাদীর—তাঁহার আদর্শ উদ্‌যাপনের পরিণতিই বা কি ?

তাঁহার ডায়রী বা রোজনামচার পাতায় পাতায় যেন ইহার ইঙ্গিত পাই তাহাতে লেখা আছে—

"রংপুর জেলে শেষের দিক দিয়া এই যে ঝাঁকানি—বেশই লাগিল। এই বয়সে—এই স্বাস্থ্যে, একেবারে একাকী এই সব issue লইয়া যে struggle টা করিলাম, তাহাতে এই বয়সে আমার অতিরিক্ত মানসিক স্বাস্থ্য, শক্তি, technique ইত্যাদির পরিচয় পাইতেও বেশ সাহায্য করিয়াছে। আমার সবলতা, দুর্ব্বলতা, আদর্শ ইত্যাদির পরিচয় আমি অনেকটা পাইয়াছি।"

কোন আদর্শ সতীন্দ্রনাথের ছিল, কোন প্রেরণায় তিনি সর্ব্ববিপদ-লাঞ্ছনা বরণ করিবার জন্য সদা-প্রস্তুত ছিলেন ?

"আমার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যে মনোবল, সংকল্প, অধ্যবসায়, সাহস প্রভৃতির প্রয়োজন (সত্য ও অহিংসার দরকার) organisation আয়োজনের যে প্রস্তুতির প্রয়োজন তাহার Capacity—আছে কি ? Moslem majority সেখানে পাকিস্থানে তাঁহাদের চেনা, বোঝা, তাহাদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস প্রভৃতি—সবলতা, দুর্ব্বলতা খুব ভাল করিয়া হৃদয় দিয়া, বুদ্ধি দিয়া, বুঝিয়া তাহাদের ভালবাসিতে হইবে।" "এদের কল্যাণ চাই—এরা আমার অকল্যাণ চায় ভুলে, এতে এদেরই লোকসান। গান্ধীজীকে Jessus Christকে তাহাদের স্বদেশবাসী হত্যা করিল। এই tragedy তো জীবনে আছে—একে boldly face করিতে হইবে।—সুতরাং মানুষের এই পথ—এতেই দেশের এবং বিশ্বের কল্যাণ।"—এই ত ছিল মানুষের মতন মানুষের উক্তি।

* * * *

রোগবিস্তার :

পাবনা জেলে আসিবার পর ২৮শে ডিসেম্বর শরীরে যে প্রথম গ্লানি ও উপসর্গ দেখা দিল তাহার বিষয় তিনি তাঁহার রোজনামচায় লিখিয়া গেলেন যে পূর্ব্বদিন শরীরটা খুবই খারাপ ছিল—সারা সকালটা vomiting tendency তাঁহাকে কষ্ট দেয়। ৫।৬ই জানুয়ারী হইতে শরীর বেশ খারাপই বোধ করিতেছিলেন।

১০ই জানুয়ারী শরীরের উত্তাপ গ্রহণ করিয়া দেখা গেল জ্বর হইতেছে। এখন হইতে প্রত্যহই জ্বর হইতে থাকে। প্রথম কয়েকদিন বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত জ্বর থাকিত। ১৮ই জানুয়ারী প্রথম কুইনাইন মিক্শ্চার গ্রহণ করেন। পরে সন্ধ্যা ৬টা হইতে রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত প্রত্যহ জ্বর উঠিত। দেহের উত্তাপ কখনও ১০১ ডিগ্রীর উপর উঠে নাই। রাত্রের অনিদ্রা শরীরে অস্বস্তি—এ সময় ক্যালসিয়াম দেওয়া হইল।

রোজনামচায় লেখা—"এবার জেলে এই প্রথম Allopathic ঔষধ internally ব্যবহার করিলাম—খুব heavy dose—শরীরের জ্বালা ইত্যাদি খুব—যন্ত্রণা খুব—প্রস্রাব প্রভৃতির troubleও বেশ।"

"জানুয়ারী মাস ভোর স্বাস্থ্য খুব খারাপ যাইতেছে। temperature টা malaria মনে করিয়া Quinine mixture ইত্যাদি দিলেন। shivering controlled হইলেও জ্বর আবার সুরু হইয়াছে। feverishness ছিল সারারাত এবং ঘুমও নাই···Rangpur T. B ward হইতে কোন mischief contact করা ছিল কি ?—যদি serious কোন trouble হইয়া থাকে—early detection ও diognised হয়, তা হইলে ভাবনার কিছু নাই।"

"নানা distressing symptoms, suffering বেশ, মুখে রুচি না থাকায় আরো কষ্ট বেশী। বাহিরে rumour Cancer—S. A. S. এর আশঙ্কা T. B. etc.—চরম danger। মনে

কোন ভীতি নাই—Calmly face করিব—যাহাই হউক, যদি এর কোনটাই হয় এবং carefully suitable treatment ইহার ব্যবস্থাহয়—তা হইলে ভাবনার কিছু নাই। মরিতেই বা কি—মৃত্যু তো একদিন আসিবেই। তবে যে ব্রত নিয়া আছি তাহার শেষ দেখিবার সাধ খুব বেশী।"

৬ই ফেব্রুয়ারী M. O. আসিলেন। তিনি আরও কিছুদিন চেষ্টা করিতে চান। নূতন তিনটি ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন—পাওয়া গেল মাত্র একটা।

রোজনামচায় লেখা—"আমার মনে হয় line ঠিক হইতেছে না। S. A. S. এর ধারণা lungs T. B. তিনি agree করেন, immediatly ঢাকা transfer করা উচিত।"

১৯ই ফেব্রুয়ারী স্থানীয় Medical officer I. G. এর নিকট লিখিলেন "আমাকে অবিলম্বে preferably Dacca Medical College এ transfer এর জন্য for things investigation of my troubles and treatment."

২০শে ফেব্রুয়ারী I. G. বিস্তারিত রিপোর্ট চাহিয়া পাঠাইলেন এবং উহা পাঠান হইল। ক্ষুব্ধ সতীন্দ্রনাথ লিখিলেন ঃ

"অদ্ভুত! M, O, recomends for immediate transfer এর জবাবে আসে detailed report চাওয়া! Local M, O, who is the civil Surgeon of a District—scant regard. How irresponsible!"

সতীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ জাগিল যে এই দীর্ঘসূত্রতা কি

ইচ্ছাকৃত বা অবহেলাজনিত। শারীরিক অবস্থা ক্রমেই আশঙ্কা-জনক হইয়া উঠিল, দীর্ঘসূত্রতা করিবার অবসর নাই। সুতরাং অবিলম্বে তিনি ঢাকা সরকারী দপ্তরে ১৯৫৪ সনের ২২শে ফেব্রুয়ারী তার পাঠাইলেন।

Asst. Secretary, Home,

Through Superintendent, Pabna Jail.

Health undergone serious deterioration, daily temperature, loss of weight 17lbs, loss of appetite, little sleep, other complications, x'ray unavailable, Pathological arrangements undependable, all medicines prescribed by M. O. not available, contractor not supplying many articles within contract, including some fruits. Delay dangerous for my health. Immediate unconditional release enabling my own medical arrangement. Pray immediate best medical examination treatment.

Satin Sen.

* * * *

শেষযাত্রা :

অবশেষে ১৯৫৫ সনের ৭ই মার্চ্চ, ঢাকায় বদলীর হুকুম আসিল। ৮ই মার্চ্চ সতীন্দ্রনাথের বুক পরীক্ষা করা হইল। রক্তের চাপ ও হার্টের অবস্থা বিবেচনা করিয়া সেই দিবস যাত্রা

স্থগিত রাখা হইল। যাতায়াতের ক্লেশ স্বীকারের শারীরিক অক্ষমতা হেতু পর পর চারিদিনই তাঁহার যাত্রা স্থগিত রহিল।

শেষের দিকে সতীন্দ্রনাথ তাঁহার কংগ্রেসের সহকর্ম্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অতীব আগ্রহশীল হইয়া উঠিয়াছিলেন। নিজের আত্মীয় পরিজনকে না ডাকিয়া, তিনি আহ্বান করিলেন তাঁহার নেতৃস্থানীয় বন্ধুদের —তাহাদের নিকটই হয় তো তাঁহার মনের শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করিবার বাসনা ছিল। কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় এই যে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ পাইয়াও কেহই জীবিত অবস্থায় তাহাকে দেখিবার কোন চেষ্টা করেন নাই!

মহানির্ব্বাণ

১১ই মার্চ্চ সতীন্দ্রনাথকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আনয়ন করা হইল। এবং ১৩ই মার্চ্চ ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্ত্তী করান হইল। ১১ই মার্চ্চ ঢাকা জেল হইতে লিখিত তাঁহার শেষ পত্র শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার দাস মহাশয় ১৮ই মার্চ্চ পান। তাহাতে লিখিত ছিল সতীন্দ্রনাথের সহিত অবিলম্বে সাক্ষাৎ করিবার কথা। অবশ্য তিনি সতীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ২৫শে মার্চ্চ রাত্রি এগারটার সময়—যখন সতীন্দ্রনাথ ছিলেন মরণের প্রতীক্ষায় অচৈতন্য। একজন আই, বির লোক তাঁহাকে সংবাদ দিল যে সতীন্দ্রনাথকে মুক্ত করা হইয়াছে, এখন হাসপাতালে দেখিতে যাইতে পারেন। অচৈতন্য সতীন্দ্রনাথকে তখন oxygen দেওয়া হইতেছিল। তাঁহার বুকের উপর সাদা কাগজে হস্তলিখিত একটুকরা কাগজে তাঁহার মুক্তির সংবাদ লিখা ছিল। যখন এই তথাকথিত মুক্তি দেওয়া হয় তখন তিনি ছিলেন জ্ঞানহীন—শেষ নিশ্বাসের প্রতীক্ষায়।

রাত্রি প্রায় দেড় ঘটিকার সময় তাঁহার শেষ নিশ্বাস মহা অনন্তে মিলাইয়া গেল। শেষ মুহূর্ত্তে শয্যাপার্শ্বে কেহ ছিল না, কেহ দেখিলনা—কেহ চোখের দুই ফোঁটা অশ্রু পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারিলনা।

অন্তিম শয়নে—সতীন্দ্র নাথ

(২৫শে মার্চ্চ ১৯৫৪)

সংবাদ পাইয়া পরদিবস প্রাতে তাঁহার ঢাকার বন্ধুবান্ধবগণ মৃতদেহ আনয়ন করিবার জন্য কলেজহাসপাতালে আসিলেন— মৃতদেহ তখন পাঠান হইয়াছে মর্গে !

সত্যাগ্রহীর crucification পরিপূর্ণ হইল !

চির-বিদ্রোহী, বিপ্লবী, বীর সতীন্দ্রনাথ দেশের পুঞ্জীভূত হলাহল পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইলেন। একটি অগ্নিশিখা নিজে জ্বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী অন্ধকার দূর করিয়া—সুদূরপ্রসারী দীপ্তি ছড়াইয়া—মহাকালের কোলে আবার নিভিয়া গেল।

..."কী গাহিবে, কী শুনাবে। বলো, মিথ্যা আপনার সুখ
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থ মগ্ন যেজন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখেনি বাঁচিতে।
মহাবিশ্বজীবনের তরঙ্গেতে নাচিতে নাচিতে
নির্ভয়ে ছুটিতে হবে সত্যেরে করিয়া ধ্রুবতারা।
মৃত্যুরে করি না শঙ্কা। দুর্দিনের অশ্রু জলধারা
মস্তকে পড়িবে ঝরি—তারি মাঝে যাব অভিসারে
তার কাছে—জীবন সর্ব্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
কে সে। জানি না কে। চিনি নাই তারে—
জন্ম জন্ম ধরি। শুধু জানি যে শুনেছে কানে
তাহার আহ্বান-গীত, ছুটেছে সে নির্ভীক পরাণে
সঙ্কট আবর্ত মাঝে, দিয়াছে সে বিশ্ব বিসর্জ্জন,
নির্য্যাতন লয়েছে যে বক্ষপাতি—মৃত্যুর গর্জ্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মত ?

...শুধু জানি......ক্ষুদ্রতারে দিয়া বলিদান
বর্জিতে হইবে দূরে জীবনের সর্ব্ব অসম্মান
সম্মুখে দাঁড়াতে হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি
যে মস্তকে ভয় লেখে নাই লেখা, দাসত্বের ধুলি
আঁকে নাই কলঙ্ক তিলক। তাহার অন্তরে রাখি
জীবনকণ্টকপথে যেতে হবে নীরবে একাকী
প্রতি দিবসের কর্ম্মে প্রতিদিন নিরলস থাকি"
সুখী করি সর্ব্বজনে..................

অবশেষে

ছেদ পড়িয়া গেল মহামানবের মহাজীবনে। এমনি করিয়াই এক মহাসমস্যা বুকে লইয়া বীরজীবন সেদিন নিভিয়া গেল। অগ্নি-পূজারীর শ্রেয় ও প্রেয় বস্তু যে পথেই লীন হউক না কেন—জাতির নিকট রহিয়া গেল এক মহা জিজ্ঞাসা, শেষ-প্রশ্ন—এ কি মৃত্যু, মুক্তি না বিনাশ? জানি—নিশ্চিতই একদিন সে উত্তর লিখিত হইবে আগামী কালের শক্তিধর লেখকের জ্বলন্ত অগ্নিবর্ষী ভাষায়। আজ শুধু তাহা লেখা হইল করুণ অশ্রুজলের ধারায়। হ'য়ত বা তাহা অস্পষ্ট—হয়তো ভাবাবেগে গ্রন্থিহীন ও বাস্তব ঘটনার সন্নিবেশে রূঢ়। জানি এ লেখায় তেমন ঔজ্জ্বল্য নাই—নাই ভাষার ঝঙ্কার—ভাবের আবেগ। তথাপি ইহা রচিত অনুগত সহকর্ম্মীর লিখিত বিবরণী রূপে, ভাবী কালের উপযুক্ততর লেখা ও আলেখ্য রচনার উপকরণ হইয়া।

দিন আসিবে, যেদিন বাংলার অভ্যুদয় দিনের জনগণ-অধিনায়ক ও নেতা এ প্রশ্নের নিরসন করিবেন—এ-মৃত্যু দণ্ড না মুক্তি? আজ শুধু এ প্রশ্নই রহিল উদগ্র হইয়া—কেন এ মৃত্যু, কার বা কাহাদের উপেক্ষায় এ দুর্দ্দৈব—কি সে হেতু যাহার জন্য বাংলার মুক্তি-সাধক সর্ব্বত্যাগী বিপ্লবী, অসহায়

বন্দীরূপে তিলে তিলে কারাগারের মধ্যে আপনাকে ক্ষয় করিয়া, হীনতর ব্যবস্থা ও উপেক্ষার মধ্য দিয়া লোকলোচনের অন্তরালে নিঃশব্দে ঝরিয়া গেল।

একটি আত্মীয় রহিল না শয্যাপার্শ্বে, আকুল আর্ত্তি উঠিল না কোন স্বজনের বিহ্বল কণ্ঠে, কাহারও এক ফোঁটা অশ্রুজল সেই গতাসু মানবকে শেষ তর্পণে তৃপ্ত করিল না।

প্রদীপ নিভিয়া গেল।

সেদিন মৃত্যুশয্যার পাশে ছিলেন কয়েকটি ছাত্র ও কয়েকটি সেবক—নিতান্ত অপরিচিত ও অজ্ঞাত। সেদিন তাঁহাদেরই একজন কৌতূহলী কণ্ঠে প্রশ্ন করিয়াছিলেন বিদায়ী বীরকে— "আপনার কি কেউ নেই?"

রোগকাতরদেহে প্রসন্ন হাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন এই মুক্তি-পূজারী—"আমার সবই আছে—মৃত্যুর পর জানতে পারবে।" সত্যই সেদিন তাঁহার কেহ ছিল না—যাঁহার সবই ছিল।

মৃত্যুর পরও সে এক নির্ম্মম পরিহাস—অভিনব প্রহসন!

২৬শে মার্চ একটী প্রেসনোটে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার প্রচার করিলেন—"অসুস্থতার জন্য শ্রীসতীন্দ্রনাথ সেনকে গতকল্য (২৫শে মার্চ) মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তির অব্যবহিত পরেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া শ্রীযুত সেনের মৃত্যু হয়—ইহা খুবই দুঃখের সংবাদ এবং গভর্ণমেন্ট এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছেন।"

অথচ মৃতদেহ আনয়ন করিবার সময়ে হাসপাতাল কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যে Death Certificate দেওয়া হয় উহাতে উল্লেখ

থাকে—"Satindra Nath Sen, Security Prisoner, C/o Supdt. Dacca Central Jail." অর্থাৎ সতীন্দ্রনাথের তথাকথিত মুক্তি-সংবাদ হাসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পর্য্যন্ত ছিল অজ্ঞাত!

মৃত্যুর পর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীদিলীপ সেন বিভিন্ন সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন—"ইচ্ছাকৃত অবহেলার জন্যই এই মৃত্যু হইয়াছে। সময় থাকিতে বাহিরে কাহাকেও—কোন আত্মীয় পরিজনকেও কোন সংবাদ দেওয়া হয় নাই।"

সতীন্দ্রনাথের উপর নিষ্ঠুর অবহেলা, তাচ্ছিল্য ও হৃদয়হীন ব্যবহার তাঁহার জীবনের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত করা হইল।

অসহায় বন্দীকে আত্মীয়-পরিত্যক্ত অবস্থায়, নিতান্ত মনুষ্যোচিত করুণায় সাধারণে যাহা করে—সেদিনকার অসাধারণ সেই শাসকের শাসন-নীতি কি সেটুকুও করিতে পারে নাই? কেন?

এ হৃদয়হীন ব্যবহারের বিবরণ আছে শয্যাপার্শ্বে উপবিষ্ট এক ছাত্রের বর্ণনার ও এক নার্সের ভাষায়।

ছাত্রটি বলিল—"একদিন সতীনবাবুকে শয্যায় মলমূত্রসহ অসহায় ভাবে শায়িত দেখা গিয়াছিল—ঐ অবস্থায় তিনি ৩।৪ ঘণ্টা ছিলেন—কেহ দেখা শুনা করিবার দরকার বোধ করে নাই।" একটী পুরুষ নার্স বলিল—"একদিন সতীনবাবুকে ভাল করিয়া খাওয়াইয়াছিলাম, খাইবার পর তিনি বলিলেন, ২।৩ দিন এ রকম ভাল খাইতে পারিলে তিনি সুস্থ হইয়া উঠিতেন।"

যাহার প্রতি প্রয়োগ করা হইতেছিল কর্তৃপক্ষের উপেক্ষা, ও প্রচণ্ড রূঢ়তা, শাসকের নির্ম্মমতায় যাঁহাকে দুনিয়া হইতে লইতে হইতেছিল চির বিদায়—যাঁহার জন্য চলিতেছিল দীর্ঘ দিবসব্যাপী মৃত্যুর এই আয়োজন—সেই মৃত্যুপথযাত্রীর মনের মধ্যে তখন কী অপরূপ কল্পনা, কী স্বর্গীয় কামনাই না উদয় হইতে দেখি! তিনি লিখিয়া গেলেন—"ঈশাবাস্য পাঠের পর হইতে চিন্তা আসিতেছিল ঈশাবাস্যের যে আদর্শ, গীতার যে আদর্শ তদনুযায়ী জীবন যাপন, বিশেষ করিয়া কর্ম্মীর পক্ষে—কি সুন্দর! কি মহান সে আদর্শ! অনেক দিন পর্য্যন্ত গান্ধীবাদের কথা ভাবি—ঈশোপনিষদের আদর্শে সেটা সুন্দরভাবে পালিত হইতে পারে।——সর্ব্বোদয় সকলের উদয়—আপন পর, সৎ অসৎ, ছোট বড়, দেশবাসী পরদেশবাসী সকলের কল্যাণ। সকলকে ভাল না বাসিলে হয় না—সর্ব্বোদয়ীর, অহিংসাশ্রয়ীর এই গভীর ভালবাসা, যাহা—যে চরম শত্রুতা সাধন করিবে এমন লোককেও ভালবাসিতে পারিবে, ক্ষমা করিতে পারিবে।—'মেরেছ কলসীর কাণা তাই বলে কি প্রেম দিব না'—এ ভাব কত সুন্দর, কত মহৎ অথচ কত দৃঢ়।"

রূঢ় আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এ মহাবিপ্লবী সংসার হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে কি অপূর্ব্ব ভাবে সকলকে ক্ষমা করিয়া গেলেন—ভালবাসা ছড়াইয়া গেলেন সারা বিশ্বে। শত্রু মিত্রের ভেদাভেদ—ব্যথা বেদনার বহু ঊর্দ্ধে ঝঙ্কৃত হইয়াছে সে মঙ্গলকামনা।

[illegible] যাহাদের মধ্যে শেষকালে কাজ করিয়াছেন,

ভালবাসিয়াছেন, যাহাদের ধর্ম্ম, কৃষ্টি, ইতিহাস, সবলতা ভাল করিয়া হৃদয় দিয়া বুদ্ধি দিয়া বুঝিয়াছেন, সর্ব্বোপরি যাহাদের জন্য তাঁহার জীবন তিল তিল করিয়া দান করিয়া গিয়াছেন তাহাদের মধ্যে কোন্ প্রতিক্রিয়া দেখি? পূর্ব্বপাকিস্থানের প্রগতিশীল নব্য তরুণদের জাগ্রত চেতনা [illegible] দেখিয়াছেন—তাঁহার স্বপ্ন সকল হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছেন। "একটা প্রকাণ্ড গাছের ছায়ায় ছিলাম—সে গাছ, সে ছায়া সরিয়া গেল। বাংলার লৌহমানব দোয়া করবেন"—ইহাই ছিল সেদিনকার পাকিস্থানের তরুণদের উক্তি।

মৃত্যুর পর—একটি বিরাট মানুষের পরিনির্ব্বাণের পর, তাঁহার শ্রাদ্ধ দিনে সে কি অভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধা নিবেদন। বরিশাল ও পটুয়াখালির শ্রাদ্ধ-বাসরে, ভারে ভারে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য—নানা উপচার সাজাইয়া ছুটিয়া আসিতে লাগিল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—অশ্রু-সজল চক্ষে ছুটিয়া আসিল তাঁহার মুসলমান ভায়ের দল। স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধা-পূরিত চিত্তে তাহারা ফুলমালায় সাজাইল শ্রাদ্ধ-বাসর, আসিল কীর্ত্তন, বাজিল শঙ্খ, ঝঙ্কৃত হইল বেদ-মন্ত্র, গীতা, বাইবেল, কোরাণ। অসংখ্য নরনারীর কণ্ঠে সেদিন ধ্বনিত হইয়া উঠিল—রামধুন। গান্ধী-শিষ্যের মৃত্যু-বাসরে গান্ধীজীর পরমপ্রিয়, রামধুন—

"ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম—"

সার্থক সে তর্পণ অযাচিত, অনিমন্ত্রিত, শত শত নরনারীর সজলচোখের অশ্রুধারায়।

আর অতুলনীয় ছিল সেই শ্রাদ্ধোপলক্ষে পংক্তি-ভোজনের ব্যবস্থা। সে মহান দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। বরিশালে ও পটুয়াখালিতে ঐ দিনে সমাগত ৫।৬ হাজার হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সর্ব্ববিধ বাধা ভুলিয়া—উচনীচ, ধনী-নির্ধন, উচ্চপদস্থ অভ্যাগত ও সাধারণ গ্রামবাসী সকলে মিলিয়া একই পংক্তি-ভোজনে যোগদান করিলেন।

সমগ্র জীবনব্যাপী—পরার্থে আকণ্ঠ হলাহল পান করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী বীর যে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন শেষের দিনে তাহাই দান করিয়া গেলেন তাঁহার দেশবাসীকে—
স্বর্ণাক্ষরে তাঁহার দিনলিপিতে শেষ-লেখা লিখিয়া গেলেন—

"The first thing and the last thing is love,
love, love worldwide, universal।"

'সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই'—এই অমৃতময় বাক্যকে জীবনে রূপায়িত করিয়া মানুষের মতন মানুষ সতীন্দ্রনাথ নির্ব্বাণ লাভ করিলেন, আর সর্ব্বব্যাপী—বিশ্বব্যাপী প্রেমই রহিল সতীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথম ও শেষ দান।

এ দান সত্যের তপস্যালোকে প্রদীপ্ত—শাশ্বত জীবনের মৃত্যুঞ্জয়ী মহিমায় সমৃদ্ধ!